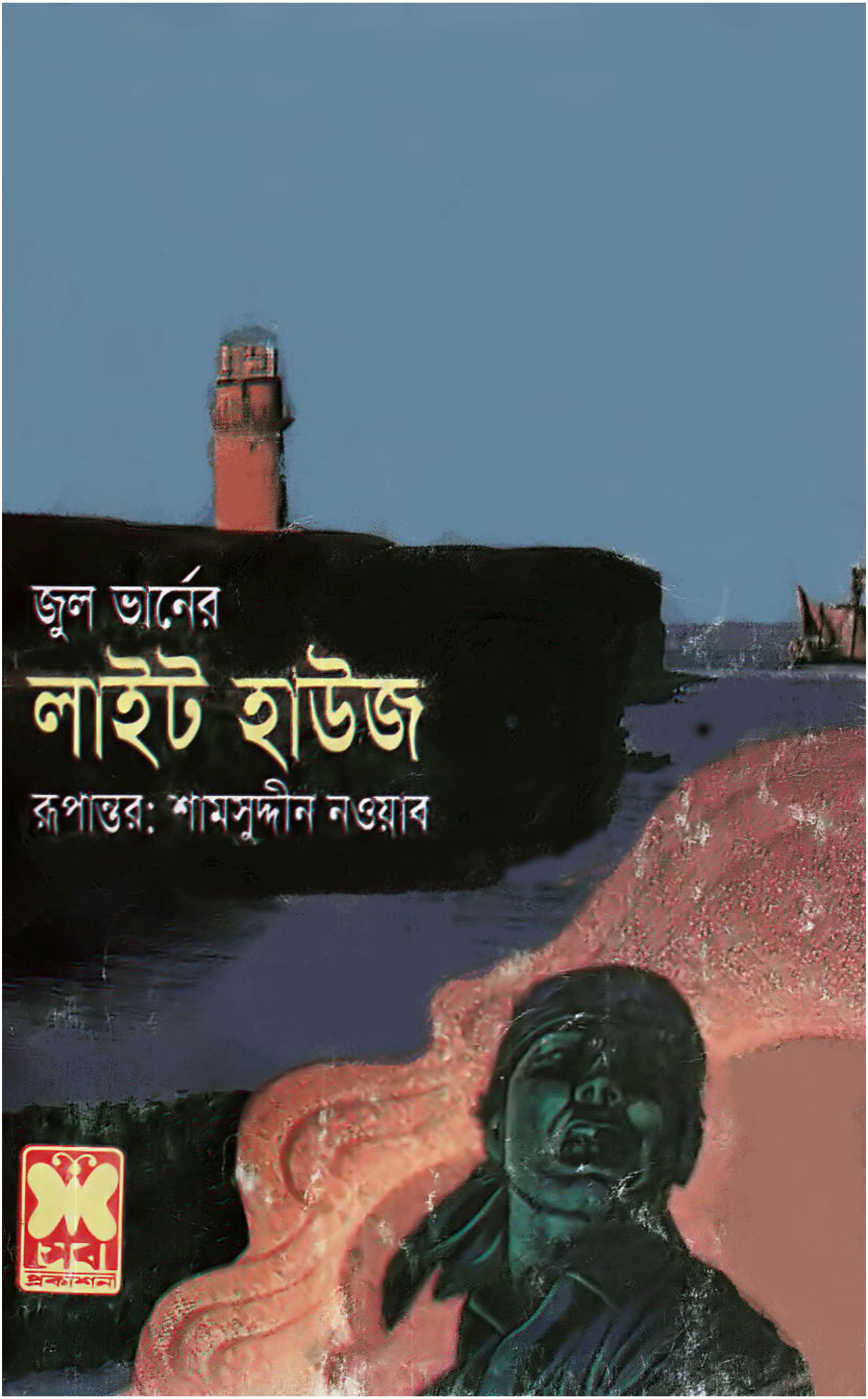
জুল ভার্নের
লাইট হাউজ
রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব
সবা
প্রকাশনা

জুল ভার্ন

লাইট হাউজ

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

গল্পকারদের রাজা জুল ভার্ন এবার আমাদেরকে নিয়ে চলেছেন দুনিয়ার শেষপ্রান্তে। সমুদ্র সেখানে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, আকাশে সারাক্ষণ দুর্যোগের ঘনঘটা, অন্তরীপগুলো মৃত্যুফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। আর্জেন্টিনা সরকার ওখানে একটা বাতিঘর তৈরি করল, কিন্তু কেউ জানে না নির্জন দ্বীপটায় অনেক আগে থেকেই ঘাঁটি তৈরি করে বসে আছে একদল জলদস্যু। জলদস্যুদের সর্দার কনগ্রে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। প্রহরীদের প্রধান বাস্‌কেথ একা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

জুল ভার্নের

লাইট হাউজ

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3151-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

LIGHT HOUSE
Jules Verne
Trans by: Shamsuddin Nawab

সাতাশ টাকা

জুল ভার্ন

ইতিহাস, ভুগোল ও বিশেষ করে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে, তার সাথে অপূর্ব কল্পনার রঙ মিশিয়ে আশ্চর্য সব রোমাঞ্চ-কাহিনী রচনা করে গেছেন জুল ভার্ন। 'ফাইভ উইকস ইন আ বেলুন,' 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দ্য সী', 'ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন', 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ', 'জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দি আর্থ', 'মিষ্টিরিয়াস আইল্যান্ড', ইত্যাদি অমর সৃষ্টি তাঁকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কাহিনীর রস ও আমেজ কোনভাবে ক্ষুণ্ন না করে বিশালাকার মূল রচনাগুলোকে কিছুটা সংক্ষেপ করে রূপান্তরিত করা হয়েছে বাংলায়।

১৮২৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের বিস্কে উপসাগরের ফায়েদ্যু দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন জুল ভার্ন। মারা যান ১৯০৫ সালের ২৪ মার্চ। ভিক্টর হুগো প্রভৃতি অমর সাহিত্যিকদের যে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্য ফ্রেঞ্চ আকাদেমি সেই একই সম্মানে ভূষিত করেছিল জুল ভার্নকে।

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
ক'টি বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

কাজী মায়মুর হোসেন
গ্রহান্তরের আগ্রাসন।

কাজী শাহনূর হোসেন
সবুজ মানব, মরা মানুষের শহর, অশুভ পিরামিড, গুহামানবের কবলে, সাগরপিশাচ, মৃত্যু-রোবট, মহাকাশে বন্দী, অন্ধকূপের রহস্য, আঁধারের আততায়ী, কয়লাখনির আতঙ্ক, বন্ধকারখানার রহস্য, জলাভূমির ভয়ঙ্কর, পাতাল বিভীষিকা।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
অশুভ শক্তি।

জুল ভার্ন/শামসুদ্দীন নওয়াব
বেগমের রত্নভাণ্ডার, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, রহস্যের দ্বীপ, মাইকেল স্ট্রগফ, নোঙর ছেঁড়া, সাগর তলে, কার্পেথিয়ান দুর্গ, গুপ্ত রহস্য, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, চাঁদে অভিযান, নাইজারের বাঁকে, মরুশহর, মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড, আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ, পাতাল অভিযান, ব্ল্যাক ডায়মন্ড, ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্স্ ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

পশ্চিমের সারি সারি পাহাড়গুলো কালো পর্দার মত ঢেকে রেখেছে আকাশটাকে। যাই যাই করছে সূর্য, এই ডোবে এই ডুবল অবস্থা। ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। একেবারে শান্ত আবহাওয়া, এদিকে এমনটি সাধারণত দেখা যায় না। পুব আর উত্তর-পুব দিকে তাকালে আকাশ ও সমুদ্রকে আলাদাভাবে চেনা যাবে না, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—অন্তত দূর থেকে খালি চোখে দেখলে তাই মনে হবে। শেষ মুহূর্তের কমলা রোদ এখন শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলোর গায়েই লেগে আছে, তবে সমুদ্রের গাঢ় নীল পানিতে সেই রঙ ঝিকমিক করছে সারাক্ষণ।

সবগুলো নোঙর ফেলে ইগোর উপসাগরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সান্তা ফে। উত্তর মেক্সিকোর বিখ্যাত শহর সান্তা ফে, ওই শহরের নামেই নাম রাখা হয়েছে জাহাজটার।

জাহাজের ডেক থেকে হঠাৎ পিলে চমকানো শব্দে গর্জে উঠল একটা কামান। পরমুহূর্তে দেখা গেল আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা তরতর করে মাস্তুলের মাথায় উঠে যাচ্ছে। খোলা সাগরের বাতাস পেয়ে পতপত করে উড়তে লাগল সেটা। পরক্ষণে, যেন সাড়া দেয়ার জন্যে তৈরিই ছিল, বাতিঘর থেকে

একটা রাইফেল গর্জে উঠল। গুলির শব্দ আসলে একটা সঙ্কেত, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোর একটা চোখ-ধাঁধানো ছটা পিছলে পড়ল ইগোর উপসাগরের পানিতে।

বাতিঘরের দু'জন রক্ষী সৈকতে এসে দাঁড়াল। জাহাজ থেকে ওদেরকে দেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে অভিনন্দন জানাল একজন নাবিক।

রাইফেলের আরও একজোড়া শব্দ স্টাটেন আইল্যান্ডের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই আওয়াজ আরও জোরাল হয়ে ফিরে আসছে।

কোথায় এই স্টাটেন আইল্যান্ড?

যেখানে দুই মহাসাগর এক হয়ে মিশেছে, আটলান্টিক আর প্যাসিফিক মহাসাগর যেখানে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে—হ্যাঁ, সেখানেই সবুজ অরণ্যসমৃদ্ধ মাথাটা তুলে সূর্যকে অভিবাদন জানায় স্টাটেন আইল্যান্ড।

কামান ও রাইফেলের আওয়াজ ইতিমধ্যে থেমেছে। স্টাটেন আইল্যান্ডে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। দ্বীপটায় রক্ষী ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু ওদেরকেই বহাল করা হয়েছে কাজে। সংখ্যায় ওরা মাত্র তিনজন।

একজন এই মুহূর্তে বাতিঘরের টাওয়ারে কাজ করছে। বাকি দু'জনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈকতে। অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে তারা।

দু'জনের মধ্যে একজনের বয়স কম। সে-ই কথা বলছে, 'সত্যি তাহলে কালকেই সান্তা ফে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে? তুমি ঠিক জানো তো, বাস্‌কেথ?'

'হ্যাঁ, ঠিক জানি, ফিলিপ,' উত্তর দিল বাস্‌কেথ। 'এসো, আমরা প্রার্থনা করি সান্তা ফে যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে

পারে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' মনটা খারাপ, তবু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল ফিলিপ।

হ্যাঁ, শুধু প্রার্থনা আর আশাই করতে পারে ওরা। সান্তা ফে সত্যি সত্যি বুয়েনস আইরেসে ফিরতে পারবে এ-কথা ফিলিপ বা বাস্‌কেথের পক্ষে জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা নির্ভর করে প্রকৃতি আর ভাগ্যের মর্জির ওপর। সমুদ্র যদি খেপে ওঠে, সান্তা ফে আশ্রয় নেবে কোথায়? টিয়েরা ডেল ফুয়েগো থেকে শুরু করে পাতাগোরিয়া পর্যন্ত উপকূলের কোথাও নিরাপদ এমন কোন জায়গা নেই যে সমুদ্রে ঝড় উঠলে কোন জাহাজ আশ্রয় পাবার জন্যে নোঙর ফেলতে পারে। ম্যাগেলান প্রণালীর এদিকটায় সামুদ্রিক তুফান শুধু যে ঘন ঘন আঘাত হানে তা নয়, তাণ্ডব সৃষ্টিতেও তার জুড়ি মেলা ভার। নাবিকরা এই জলপথটাকে নানা কারণেই সাংঘাতিক ভয় পায়। বেয়াড়া সমুদ্র প্রায়ই অসহায় জাহাজকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। ভাগ্য ভাল হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গন্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যায় ক্যাপটেন। আর ভাগ্য খারাপ হলে অন্তরীপ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে সোজা পাতালে নেমে যেতে হয়। এভাবে কত জাহাজ যে ডুবেছে, তার কোন লেখাজোখা নেই। তবে এতকাল পর সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।

স্টাটেন আইল্যান্ডে এখন বাতিঘর বসানো হয়েছে। এই বাতিঘরের আলো জাহাজগুলোকে পথ দেখাবে, সঙ্কেত দিয়ে জানাবে কোন্ দিকে কি বিপদ আছে। আশা করা যায় যতই ঝড়-তুফান উঠুক, বাতিঘরের আলো আর নিভবে না। জাহাজের ক্যাপটেনরা শুধু যে দুর্যোগকে ভয় পায় তা নয়, ঘুটঘুটে অন্ধকার

রাতকেও একই রকম ভয় পায় তারা। অন্ধকার রাতেই তো তিনটে অন্তরীপের দিকে যাবার পথ মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এগুলো হলো সান হুয়ান অন্তরীপ, সান দিয়েগো অন্তরীপ আর ফালোস অন্তরীপ। অন্ধকার রাতে এগুলো এক একটা মৃত্যুফাঁদ হয়ে ওঠে। বাতিঘরের আলো সেই মৃত্যুফাঁদ থেকে রক্ষা করবে জাহাজগুলোকে।

স্টাটেন আইল্যান্ডে কোন মানুষজন নেই। অথচ এই দ্বীপে ওদেরকে তিন মাস একটানা কাটাতে হবে। ব্যাপারটা যখন প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করল ফিলিপ, তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই নব্বুই দিন সভ্য-জগতের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। তিন মাস পর আরও তিনজন নতুন আলোকরক্ষী আসবে, বাতিঘরের সমস্ত দায়িত্ব ওদের কাছ থেকে বুঝে নেবে তারা। তার আগে এই কারাগার থেকে ওদের মুক্তি নেই।

কোন জাহাজে দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কিছু নয়, কারণ সেখানে আরও অনেক নাবিক ও ক্রু আছে, জাহাজটাও সচল, কিছু দিন পরপর একটা করে নতুন বন্দরে ভিড়ছে। কিন্তু নির্জন এই স্টাটেন দ্বীপটাকে জেলখানাই বলতে হবে, কারণ ইচ্ছা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের আগে এখান থেকে চলে যাবার কোন উপায় নেই। ফিলিপ যখন চাকরির জন্যে আবেদন করেছিল, এদিকটা এভাবে ভেবে দেখেনি। চাকরি নিয়ে দ্বীপে আসার পর পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তার মন খারাপ হয়ে গেছে।

ফিলিপের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বাস্‌কেথ তাকে নানাভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করছে। 'আরে, মাত্র তো তিনটে মাস, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তাছাড়া, আমরা যে সুযোগ পেয়েছি, ভেবে দেখো, এমন সুযোগ কজন পায়? ঝড়-তুফানে

পড়ে মানুষ এখানে প্রাণ হারাচ্ছে। আমরা তাদেরকে আলো ফেলে পথ দেখাব, সাবধান করে দেব। এটাকে তোমার একটা মহৎ কাজ বলে মনে হচ্ছে না?'

ফিলিপ ম্লান একটু হাসল শুধু, মুখ খুলল না।

'দেখো, ফিলিপ, আজ চল্লিশ বছর হতে চলল সমুদ্রকেই আমি ঘর বানিয়েছি। একটা নয়, বহু জাহাজে চাকরি করেছি আমি। কোনটায় কেবিন বয় ছিলাম, কোনটায় কুক। দিনে দিনে আমার উন্নতিও হয়েছে। এক সময় নাবিক হই। তারপর অফিসার। দুনিয়ার সব সাগরই দেখা হয়েছে। এমন কোন বন্দর প্রায় নেই বললেই চলে যেখানে আমার যাওয়া হয়নি। এখন যদি বলি যে আমার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে, খুব একটা ভুল হবে কি? অথচ কাজ ছাড়া আমি বাঁচব না। কিন্তু বুড়ো হলে কে আর কাকে কাজ দেয়, বলো? অগত্যা বাতিঘরের রক্ষীর চাকরির জন্যেই আমি আবেদন করি। এটা হলো একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, ফিলিপ। অনেকেই এই কাজটাকে ছোট মনে করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, এটা একটা অতি মহৎ কাজ। তাছাড়া, এটাকে তুমি কিন্তু সাধারণ কোন বাতিঘর বলে ভুল কোরো না! জানোই তো, এই বাতিঘর দুনিয়ার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে।'

বাস্‌কেথের কথা কান পেতেই শুনছে ফিলিপ। কিন্তু মনটা তার কোনমতে ভাল হচ্ছে না। বাস্‌কেথের পিছু পিছু বাতিঘরে ফিরে এল সে।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই লোকে বলে আসছে, প্রশান্ত মহাসাগরের জোয়ার নাকি তেমন জোরালো নয়। কথাটা যদি সত্যি হয়ও, আংশিক সত্যি হবারই বেশি সম্ভাবনা। বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে নির্দিষ্ট একটা এলাকার জোয়ার একটু কম

শক্তিশালী হতেই পারে। তবে কথাটা বিশেষ একটা ক্ষেত্রে যে সত্যি নয়, এটা প্রমাণ সহ নিঃসংশয়ে বলা যায়। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর যেখানে মিলিত হয়েছে, অর্থাৎ দুই মহাসাগরের সংযোগস্থল সারাক্ষণই প্রচণ্ড খেপে থাকে, আর জোয়ারের সময় তো রীতিমত প্রলয়ংকরী হয়ে ওঠে। সমুদ্র সেখানে অনবরত গর্জন করছে, ঢেউয়ের দাপটে ধারে কাছে কোন জাহাজ ঘেঁষতেই পারে না। দুই মহাসাগরের বিপুল জলরাশি এমন ভয়াবহ আলোড়ন তোলে, তার প্রভাবে সেই বহুদূর ম্যাগেলান প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত পানিপথও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

সান্তা ফে আর্জেন্টিনা নৌ-বাহিনীর জলযান। জাহাজটাকে শক্তি যোগায় একশো যাট হর্সপাওয়ার। সান্তা ফে দুশো টন কার্গো বহন করতে পারে।

জাহাজের ক্যাপটেন লাফায়েত। লেফটেন্যান্ট-এর নাম রিগাল। নাবিক আর ক্রুর সংখ্যা পঞ্চাশ। সান্তা ফের কাজ হলো রিও ডে লা প্লাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে লেময়র প্রণালীর শেষ মাথা পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরে নজর রাখা। আমাদের এই গল্প এমন এক সময়ের, যখন ক্রুজার বা টর্পেডো-বোট অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ আবিষ্কৃত হয়নি। সান্তা ফের গতিসীমা ঘণ্টায় নয় মাইল, সে-সময় এই গতিই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হত।

কাহিনীর শুরু সে বছরের গোড়ার দিকে। আর্জেন্টিনা সরকার সান্তা ফের ক্যাপটেনকে একটা কাজ দিল। লেময়র প্রণালীর প্রবেশমুখ স্টাটেন আইল্যান্ডে একটা বাতিঘর তৈরি করা হবে, কাজটার প্রস্তুতি পর্বের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে লাফায়েতকে।

সেই থেকে লোকজন, যন্ত্রপাতি, মাল-মশলা ইত্যাদি যা যা একটা বাতিঘর তৈরি করতে লাগে সবই স্টাটেন আইল্যান্ডে এনেছে সান্তা ফে। ক্যাপটেন লাফায়েত দক্ষ নাবিক, মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত সাহসী, উত্তাল সাগর ঘন ঘন পাড়ি দিতে তাঁর বুক কাঁপেনি। তবে আসা-যাওয়া করার সময় প্রায় প্রতিবারই মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাঁকে। জাহাজ ও মাঝি-মাল্লা সহ আজও যে তিনি বেঁচে আছেন, বলা যায় তা স্রেফ ভাগ্যেরই জোরে।

বাতিঘরটার নকশা তৈরি করেছেন বুয়েনস আইরেসের নাম করা একজন ডিজাইনার। বছরের শেষ দিকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বাতিঘর তৈরির কাজ সুষ্ঠুভাবেই শেষ হয়েছে। আজ প্রায় তিন হপ্তা হতে চলল শেষবার ইগোর উপসাগরে নোঙর ফেলেছে সান্তা ফে। ইতিমধ্যে চারমাসের উপযোগী রসদ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস বাতিঘরের স্টোরে জমা করা হয়েছে। ক্যাপটেন লাফায়েত নিশ্চিত হয়েছেন, বাতিঘরের তিনজন রক্ষী আগামী তিন মাস কোন জিনিসের অভাব বোধ করবে না। সম্ভাব্য যা কিছু দরকার হবে তাদের, সবই ভরা হয়েছে স্টোরে। সব কাজ শেষ। এবার স্টাটেন আইল্যান্ড ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

দুনিয়ার শেষ প্রান্তের এই বাতিঘরে রক্ষী হিসেবে চাকরি পাবার জন্যে বহু লোক আবেদন করেছিল। ইন্টারভিউয়ে টিকে গেছে তিনজন—বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস। আর্জেন্টিনা সরকার এই তিনজনকেই যোগ্য রক্ষী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি—এই তিনমাস বাতিঘর পাহারা দেবে তারা। মার্চ মাসে আবার ফিরে আসবে সান্তা ফে, সঙ্গে থাকবে তিনজন নতুন রক্ষী। তারা এসে ওদের তিনজনের কাছ

থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবে। বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস ফিরে যাবে দেশে।

মিনারের নিচে রক্ষীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওদের কোয়ার্টার অত্যন্ত শক্ত কংক্রিটের পুরু দেয়াল দিয়ে মোড়া, ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে যাতে কোন ক্ষতি না হয়। বসবাসের এই জায়গা আর মিনারে ওঠার সিঁড়ির মাঝখানে একটা বারান্দা আছে। সিঁড়িতে ওঠার দরজা ওই বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে। আলোকস্তম্ভটি সিঁড়ির মাথায়।

সিঁড়িটা সরু ও প্যাঁচানো। দেয়ালে প্রথমে গর্ত করা হয়েছে, গর্তগুলোয় বসানো হয়েছে পাথরের ধাপ, গাঁথনি অত্যন্ত মজবুত। সিঁড়িতে আলোর ব্যবস্থাও আছে। ছোট ছোট জানালা রাখা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে প্রচুর আলো ঢোকে ভেতরে। বাতিঘরের একটা কামরাকে শুধু লুকআউট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সেখানে লণ্ঠনের আতস কাঁচ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সব একেবারে নতুন, ঝকঝক করছে। গ্যালারিটা দেয়ালের গা ঘেঁষে। ওই গ্যালারিতে বসে চারদিকের সমুদ্রে নজর রাখা হবে। আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাতিঘর, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই তিনমাস নিশ্চিন্ত মনে কাটিয়ে দিতে পারবে রক্ষীরা।

পরদিন সকাল থেকে সান্তা ফেতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বিকেলে জাহাজ ছাড়বে, তাই এই ব্যস্ততা। লেফটেন্যান্ট রিগালকে সঙ্গে নিয়ে তীরে নামলেন ক্যাপটেন লাফায়েত, শেষ বারের মত সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলেন। কাল যখন সান্তা ফের ডেক থেকে কামান দাগা হলো তখনই প্রথমবারের মত জ্বলে উঠেছিল বাতিঘরের আলো। বাস্‌কেথকে ডেকে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন লাফায়েত। না, লণ্ঠন ঠিকমতই কাজ করেছে,

কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। জাহাজ নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্টাটেন আইল্যান্ড ত্যাগ করতে পারেন তিনি।

রক্ষীদের কাজ মোটেও সহজ হবে না। পরিত্যক্ত ও নির্জন একটা দ্বীপে দিনের পর দিন বাস করতে হলে মনের ওপর একটা চাপ পড়বেই। চোখের সামনে সারাক্ষণ ভেসে উঠবে প্রিয়জনদের মুখ। বন্ধুদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দিনগুলো বিষাদে ভরে উঠবে। কাজ হয়ে উঠবে একঘেয়ে।

তবে তিনজনই ওরা সহনশীল ও দক্ষ, সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও প্রচুর। বাতিঘর পাহারা দেয়ার এই চাকরি তারা স্বেচ্ছায় নিয়েছে। একে একে অনেক জাহাজে কাজ করেছে তারা, দেহে-মনে ক্লান্তিও কম জমেনি, হয়তো সেজন্যেই ক'টা মাস বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার শেষ প্রান্তে এই চাকরি নিয়ে চলে আসা। বাতিঘরের কাজ খুব বেশি নয়, আবার হালকাও বটে। রুটিন-বাঁধা কাজ, কোনরকম ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। জাহাজের কাজ কিন্তু ঠিক তার উল্টো, সেখানে প্রতিটি কাজ দ্রুত ও ব্যস্ততার সঙ্গে সারতে হয়। জাহাজে কাজ করে অভ্যস্ত, তাই হয়তো বাতিঘরের কাজ ওদের কাছে আরও হালকা লাগবে, বলতে গেলে বিশ্রামই নেয়া হবে। তাছাড়া, চাকরি তো মাত্র তিন মাসের। দেখতে দেখতে দিনগুলো পার হয়ে যাবে।

বিদায় নেয়ার আগে রক্ষীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন লাফায়েত। সবশেষে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তারা একটা মহৎ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে, সেজন্যে দেশবাসী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বিকেলে তিন আলোকরক্ষী সৈকতে এসে দাঁড়াল। সান্তা ফে নোঙর তুলে রওনা হবে এখন। জাহাজটা চলে যাবার পর স্টাটেন আইল্যান্ডে থাকবে শুধু রাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস। সৈকতে

দাঁড়িয়ে তিনজনই ওরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নাবিকদের দিকে, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে জাহাজের ডেকে তারা সবাই খুব ব্যস্ত।

বিকেল ঠিক পাঁচটায় জ্যান্ত হয়ে উঠল সান্তা ফের বয়লার। চোঙ থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ। সেই আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনি তুলল।

জোয়ার এখনও তেমন প্রবল নয়। খানিক অপেক্ষা করতে হলো। তারপর যখন জোয়ারের তোড়ে সৈকতের কাছে ফুলে-ফেঁপে উঠল পানি, সান্তা ফের সবগুলো নোঙর একে একে তুলে ফেলা হলো।

পৌনে ছ'টায় এঞ্জিনম্যানকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন লাফায়েত, 'তৈরি হও।'

সান্তা ফের এঞ্জিন চালু হলো। লেফটেন্যান্ট রিগাল একবার দেখে এলেন অপারেটর প্রস্তুত হয়েছে কিনা।

সান্তা ফে নড়ে উঠল।

সৈকতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল তিন রক্ষী। বাস্‌কেথের মনে এখন কি চলছে, চেহারা দেখে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে তার দুই সহকারীকে রীতিমত বিচলিত দেখাল। সান্তা ফের নাবিক আর ক্রুরাও মনমরা হয়ে আছে, দুনিয়ার শেষপ্রান্তে এত বড় একটা জনশূন্য দ্বীপে তিনজনকে ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে।

রওনা হয়ে গেল জাহাজটা। ইগোর উপকূলের উত্তর-পশ্চিম তীর ধরে এগোচ্ছে সান্তা ফে, গতি স্বাভাবিক। খোলা পানিতে পৌঁছাতে আটটা বেজে গেল। সামনে পড়ল সান হুয়ান অন্তরীপ, সেটাকে পাশ কাটাতে কোন অসুবিধে হলো না। পিছনে পড়ল

প্রণালীটা, তারপরই জাহাজের গতি বেড়ে গেল, ফুলস্পীডে ছুটছে। সারাদিন ছুটল সান্তা ফে, তারপর যখন আলকাতরার মত কালো রাত নামল, ডেক থেকে স্টাটেন আইল্যান্ডের বাতিঘরের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। দিগন্তের শেষ প্রান্তে খুদে একটা উজ্জ্বল তারার মত লাগল বাতিঘরটাকে।

ইতিমধ্যে সৈকত থেকে বাতিঘরের ভেতর ফিরে এসেছে রক্ষীরা। সবাই চুপচাপ, বিষণ্ন। ওরা একা হয়ে গেছে, সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, মন খারাপের সেটাই কারণ।

এই দ্বীপে সাংঘাতিক একটা বিপদ ওত্ পেতে আছে, কিন্তু সেই বিপদ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ এখনও কিছু জানে না ওরা।

স্টাটেন আইল্যান্ডকে অনেক সময় স্টাটেন ল্যান্ডও বলা হয়। দ্বীপটা আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম বিন্দুতে অবস্থিত, দুটো মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত পানিতে অবগাহন করছে। কেইপ হর্ন অন্তরীপ ঘুরে যে-সব জাহাজ আসা-যাওয়া করে ওগুলোর ডেক থেকে স্টাটেন আইল্যান্ডকে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখায়। এদিকে লেময়র নামে একটা প্রণালী আছে—প্রণালীটা টিয়েরা ডেল ফুয়েগো থেকে স্টাটেন আইল্যান্ডকে আলাদা করে রেখেছে। টিয়েরা ডেল ফুয়েগো আর স্টাটেন আইল্যান্ডের মাঝখানে ব্যবধান বিশ মাইল। দ্বীপের পুব দিকে রয়েছে সান অন্টারিয়ো আর কেম্প অন্তরীপ।

দ্বীপটা পুব-পশ্চিমে লম্বা—ঊনচল্লিশ মাইল। উত্তর-দক্ষিণে মাত্র এগারো মাইল। খাড়া পাহাড়গুলো আকাশ ছুঁয়েছে। গিরিখাদ আর খাঁড়িও আছে, নাচতে নাচতে ভেতরে ঢুকে পড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। দ্বীপে গাছপালা আর ঝোপঝাড়েরও কোন কমতি

নেই। দ্বীপটাকে ঘিরে তৈরি করে রেখেছে অসংখ্য ডুবো পাহাড়। দ্বীপের আশপাশে জাহাজডুবির ঘটনা সেজন্যেই খুব বেশি। এই ডুবোপাহাড়ের কারণেই শান্ত আবহাওয়াতেও দ্বীপের চারপাশে সারাক্ষণ খেপে থাকে সমুদ্র।

সমুদ্রের এই খেপামির জন্যেই দ্বীপটায় আজ পর্যন্ত কোন লোক বসতি গড়ে ওঠেনি। এখানে সবচেয়ে ভাল সময় বলতে বোঝায় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। তখন এখানে কোন রকমে বসবাস করা যেতে পারে, কারণ এই সময়টাই দক্ষিণ গোলার্ধের এই দ্বীপে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকাল হলে কি হবে, তখনও এখানে প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীত পড়ে।

দ্বীপের জঙ্গলে বেশ কিছু গুঅনাকো আছে। এগুলো এক জাতের আদিম হরিণ, শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই দেখা যায়। আদিম তো কি হয়েছে, মাংস খুবই সুস্বাদু। শীতকালে পুরু বরফে ঢাকা পড়ে যায় দ্বীপটা, কিন্তু তারপরও হরিণগুলো খাবারের অভাবে মারা যায় না। বৈরি আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে ওগুলো। বরফের তলায় চাপা পড়া গাছপালার শিকড় আর পাতা খুঁজে বের করে খায়।

দ্বীপটাকে আসলে প্রকাণ্ড একটা পাথুরে টিলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রাণী বলতে এখানে শুধু আছে গুঅনাকো, কিছু পাখি আর কিছু মাছ। দ্বীপের মালিক চিলি ও আর্জেন্টিনা। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে একটা বাতিঘর তৈরি করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট সব দেশের নাবিকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে আর্জেন্টিনা সরকার। এদিকের পানিতে জাহাজের খুব বেশি আনাগোনা, জলপথে সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকে। ঝড়-তুফানও খুব বেশি হয় এদিকটায়। সেজন্যেই সবার ধারণা, স্টাটেন আইল্যান্ডের বাতিঘর

নাবিকদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

দ্বীপটার মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে ঊষর মরুভূমি। তারপর থেকে বাকি দ্বীপের জমিন পাথুরে। উঁচু-নিচু, খানা-খন্দে ভরা, এখানে সেখানে হাঁ করে আছে গভীর গর্ত। আর আছে ছোট-বড় টিলা। এই দ্বীপের জন্ম আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ থেকে। পুবদিকটা অন্তরীপের মত বিস্তৃত। পশ্চিম দিকটাও তাই—উঁচু-নিচু পাহাড়ী এলাকা। অ্যান্টার্কটিকায় যে-সব অদ্ভুত দর্শন গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়, এখানেও তার কমতি নেই। তবে সমতল এলাকাটা দেখতে অনেকটাই তুন্দ্রা অঞ্চলের মত। শীতের সময় অবশ্য সবই তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। ঝড়, বৃষ্টি আর তুষারপাত—এগুলো স্টাটেন আইল্যান্ডের নিত্যসঙ্গী।

খাড়া পাহাড় শুরু হয়েছে একেবারে তীর থেকেই। এখানে কোন নদী বা ঝর্ণা নেই। গরমের দিনে রোদের তাপে বরফ গলে, সেই বরফগলা পানি এখানে সেখানে জমা হয়, তৈরি হয় ছোটখাট ঝিল। বাতিঘর তৈরি হবার পর দেখা গেল ওই ঝিলের পানি টিলাগুলোর গা বেয়ে নেমে আসছে নিচে, তারপর মিলিত হচ্ছে ইগোর উপসাগরের নীল সাগরজলে।

স্টাটেন দ্বীপ এখন শান্ত। এই মুহূর্তে কোন ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, তুষারপাত নেই। কিন্তু তবু দ্বীপটা তিন রক্ষীদের জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। এখানে একদল নিষ্ঠুর খুনী আস্তানা গেড়েছে। পৃথিবীর শেষ কিনারায়, বসবাসের অযোগ্য এই দ্বীপটাকে নিজেদের জন্যে নিরাপদ বলে মনে করেছে তারা। ওদের পেশাই হলো মানুষ খুন আর লুঠপাট করা।

ওরা একদল জলদস্যু।

দুই

সান্তা ফে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর দিন কয়েক কিছুই ঘটল না। চমৎকার আবহাওয়া, তাপমাত্রাও খুব একটা নামছে না। সকাল থেকে সন্ধের আগে পর্যন্ত রোদ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাস আছে, তবে অস্থির নয়। খুবই উপভোগ্য পরিবেশ। শুধু সন্ধের পর সামান্য শীত শীত লাগে।

বাতিঘরের চারপাশে মখমলের মত সবুজ ঘাস গজিয়েছে। ঝিলের পানিতে সাগরের দিকে নেমে যাবার টান। সোনালি দিনগুলো ভারি মিষ্টি।

সেদিন সন্ধ্যালগ্ন, বাতিঘরের আলো জ্বালবার সময়। বাতিটার সামনে বৃত্তাকার গ্যালারির কথা আগেই বলা হয়েছে, সেখানে বসে গল্প করছে ওরা তিনজন। বলাই বাহুল্য, ওরা তিনজন মানে বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস।

টোবাকো পাউচ থেকে তামাক বের করে পাইপে ভরছে বাস্‌কেথ। সহকারীদের প্রশ্ন করল, 'বেশ ক'টা দিন তো কাটল, তাই না? এবার বলো দেখি, নতুন দ্বীপে কেমন লাগছে তোমাদের? সয়ে আসছে তো?'

'এত তাড়াতাড়ি কি একঘেয়ে লাগে!' জবাব দিল ফিলিপ।

'আরও কিছুদিন যাক, তখন বুঝতে পারব। এই কদিন তো ভালই কাটল। কোন ঝুট-ঝামেলা নেই, শান্তিতে আছি।'

'একদম আমার মনের কথা বলেছ,' তাকে সমর্থন করল মরিস। 'সত্যি বড় শান্তি লাগছে। যাকে বলে নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটানো। তিনটে মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'দিগন্তে যখন কোন জাহাজের পাল অদৃশ্য হয়ে যায়, মনে হয় আমাদের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল,' বলল বাস্‌কেথ। 'এখানে আমাদের দিনগুলোও সেভাবে পার হয়ে যাবে, দেখো।'

'দিগন্ত আর জাহাজের কথা যখন উঠলই, প্রশ্নটা না করে পারছি না,' বলল ফিলিপ। 'এই কদিন আমরা কোন জাহাজ দেখিনি কেন? সবাই বলে এদিক দিয়ে নাকি প্রচুর জাহাজ আসা-যাওয়া করে, বাতিঘরটা বানানোও হয়েছে সে-কারণে। কিন্তু কই, কোন জাহাজই তো চোখে পড়ছে না। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'একটু ধৈর্য ধরো,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বলল বাস্‌কেথ। 'খুব শিগ্‌গিরই জাহাজ দেখতে পাবে। চারপাশের দশ মাইল সাগরকে আলোকিত করতে পারবে আমাদের এই বাতিঘর, তা কি শুধু শুধু তৈরি করা হয়েছে? আসলে, জিনিসটা এখনও একেবারে নতুন যে! আরও কিছুদিন গেলে মানুষজন জানতে পারবে যে এখানে একটা বাতিঘর আছে। তখন আর ঘুরপথে কেউ যাবে না, এদিকের সোজা পথ ধরে গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইবে। তখন আমরা দ্বীপের পাশ ঘেঁষে সারি সারি অনেক জাহাজ চলতে দেখব। আরেকটা কথা ভাবতে হবে। বাতিঘর থাকার কথাটা জানাই যথেষ্ট নয়, এটা ভোর পর্যন্ত আলো ছড়ায় কিনা তা-ও লোককে জানতে হবে।'

'কিন্তু সে-কথা লোকজনকে জানাবার উপায় কি? এক শুধু

সান্তা ফের লোকজনই খবরটা ছড়াতে পারে। তারমানে অপেক্ষা করতে হবে। সান্তা ফে আগে বুয়েনস আইরেসে পৌঁছাক তো।'

'হ্যাঁ, একটু তো সময় লাগবেই,' বলল বাস্‌কেথ। 'ক্যাপটেন লাফায়েতের রিপোর্ট পাওয়া মাত্র নৌ-বাহিনীর কর্তারা জাহাজ কোম্পানিগুলোকে খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু সান্তা ফে রওনাই তো হয়েছে মাত্র ছয়দিন আগে,' বলল মরিস। 'বন্দরে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি...

মাথা নাড়ল বাস্‌কেথ। 'অনেক দেরি বলছ কেন। আর হয়তো হপ্তাখানেক লাগতে পারে। তেমন জোরালো বাতাস নেই, সমুদ্রও শান্ত। পাল আর এঞ্জিন মিলে পুরোদমে চালালে সাতদিনের বেশি লাগার কথা নয়।'

'এতক্ষণে জাহাজটা নিশ্চয়ই ম্যাগেলান প্রণালী ছাড়িয়ে গেছে,' বলল ফিলিপ।

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল বাস্‌কেথ । 'এখন সম্ভবত পাতাগোনিয়ার তীর ধরে ছুটছে।'

স্বদেশের জাহাজ ওদেরকে এখানে ফেলে স্বদেশেই ফিরে যাচ্ছে, স্বভাবতই এত তাড়াতাড়ি সেটার কথা ওদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কথা উঠলেই সান্তা ফে প্রসঙ্গ ফিরে আসছে।

বাস্‌কেথ হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'কি হে, ফিলিপ, আজ তোমার মাছ ধরাটা কেমন হলো বললে না তো!'

'ভালই মাছ পেয়েছি,' বলল ফিলিপ। 'তবে আশ্চর্য কি জানো? খালি হাতেই একটা কাছিমের ছানা ধরেছি আজ। প্রায় সের দেড়েক ওজন হবে। ধরতে পারলাম পানি ছেড়ে বালির ওপর উঠে আসায়।'

'বাহ্, দারুণ!' উৎসাহ দিয়ে বলল বাস্‌কেথ। 'তবে তাড়াহুড়ো

করে খুব বেশি মাছ বা কাছিম ধরতে যেয়ো না। সমুদ্রে ওগুলো এত বেশি আছে যে যতই ধরো কোনদিন ফুরাবে না। যতটা প্রয়োজন তার বেশি ধরবে না। শুধু লক্ষ রাখবে আমাদের টিনে ভরা মাংস যাতে কম খরচ হয়। বোঝা যাচ্ছে আমিষের কোন অভাব হবে না, কিন্তু শাক-সব্জির কি ব্যবস্থা করা যায় বলো দেখি।'

'আজ আমি জঙ্গলের দিকটায় গিয়েছিলাম,' বলল মরিস। 'মাটি খুঁড়ে নরম কিছু শিকড় এনেছি, প্লেট ভরে খেতে দেব। একবার খেলে তোমরা কেউ ভুলতে পারবে না।'

'বাহ্, দারুণ,' তাকেও উৎসাহ দিল বাস্‌কেথ। 'হোক শিকড়, টাটকা জিনিস তো, খেতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। টিনের খাবার তো অগত্যা নিরুপায় হয়ে খাওয়া।'

ফিলিপ খেদ প্রকাশ করে বলল, 'ইস্, যদি দু'একটা গুঅনাকো শিকার করতে পারতাম!'

সুস্বাদু ঝোল টানার অনুকরণে মুখের ভেতর একটা আওয়াজ করল বাস্‌কেথ। 'খবরদার, ফিলিপ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি! প্রথমে গুঅনাকো শিকার করো, তারপর সেটা রান্না করো, তারপর আমার সামনে পরিবেশন করো—তার আগে ওই নাম আমার সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত কোরো না! জানো, গুঅনাকোর কথা তুলে আমার তুমি কি ক্ষতি করেছ? এরইমধ্যে আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে!'

তার কথা শুনে ফিলিপ আর মরিস গলা ছেড়ে হেসে উঠল

বাস্‌কেথ তারপর বলল, 'তবে মনে রেখো, সব সময় বাতিঘরের আশপাশে থাকবে, বেশি দূরে যাবে না। শিকার করে বেড়ানো আমাদের কাজ নয়। আমরা এখানে বাতিঘরের আলো

জ্বেলে রাখতে এসেছি। আমাদের কাজ সাগরের ওপর নজর রাখা।'

মরিস আসলে জাত শিকারী। শিকার করা তার সাংঘাতিক একটা নেশা। 'কিন্তু ভেবে দেখো, বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে নাদুসনুদুস একটা গুঅনাকোর মাথা দেখা গেল...'

'আমি তো শিকার করতে নিষেধ করছি না,' বলল বাস্‌কেথ। 'শুধু বলছি অহেতুক কোন ঝুঁকি নেবে না। আমি যতদূর জানি, এই হরিণগুলো ভীষণ পাজি টাইপের হয়। শিং দেখলেই তো বোঝা যায়, ভারী বিপজ্জনক।'

ষোলোই ডিসেম্বর। রাত ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত বাতিঘরের আলো জ্বেলে রাখার দায়িত্ব পড়েছে মরিসের ওপর। আলো জ্বেলে সমুদ্রের ওপর নজর রাখছে সে। হঠাৎ পাঁচ-ছয় মাইল পুবে একটা আলো দেখা গেল। নিশ্চয়ই কোন জাহাজেরই আলো হবে। উৎসাহ আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল মরিস। বাতিঘর তৈরি হবার পর স্টাটেন আইল্যান্ড থেকে আজ এই প্রথম কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

বাস্‌কেথ আর ফিলিপ অন্য ঘরে বসে গল্প করছে। মরিস সিদ্ধান্ত নিল, তাদেরকেও খবরটা জানানো দরকার। ওরা দায়িত্ব নেয়ার পর এই প্রথম একটা জাহাজের দেখা পাওয়া গেল, এত বড় একটা সুখবর চেপে রাখে কিভাবে! তাড়াতাড়ি ওদেরকে ডাকতে চলে এল সে। খবরটা শুনে ওরা দু'জনও উত্তেজিত হয়ে পড়ল, ছুটে লুকআউটে চলে এল তখুনি। পুবদিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপে চোখ লাগাল তিনজনই।

বেশ কিছুক্ষণ আলোটা পরীক্ষা করে বাস্‌কেথ বলল, 'সাদা

আলোর অর্থ বোঝো তো? কোন স্টীমারের সামনের দিকের আলো ওটা।'

স্টীমারটি দ্রুতবেগে সান হুয়ান অন্তরীপের দিকে ছুটে আসছে। পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যে ওটার গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল ওরা। বাতিঘরকে দক্ষিণ-পশ্চিমে রেখে লেময়র প্রণালীতে ঢুকেছে ওটা। আরও খানিক পর স্টীমারের লাল আলো দেখতে পাওয়া গেল। এক সময় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেটা অন্ধকারে।

'আমাদের বাতিঘর দুনিয়ার শেষ মাথায়, তার আওতার মধ্যে ওই জাহাজটাই প্রথম এল,' মন্তব্য করল ফিলিপ।

'হ্যাঁ,' বলল বাস্‌কেথ। 'আশা করি ওটাই শেষ জাহাজ নয়।'

পরদিন বিকেলের দিকে বিশাল পাল তোলা একটা জাহাজ দেখা গেল দিগন্তরেখার কাছে। ফিলিপই প্রথম দেখতে পেল।

আবহাওয়া আজ শান্ত, আকাশ পরিষ্কার। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে। আকাশে মেঘ নেই, দ্বীপের ওপর কুয়াশাও ঝুলে নেই। জাহাজটা দশ মাইল দূরে হলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বাস্‌কেথ আর মরিসের নাম ধরে হাঁক-ডাক শুরু করল ফিলিপ।

সবাই তখুনি ছুটে এল বাতিঘরে, টেলিস্কোপে চোখ রেখে জাহাজটাকে দেখছে। ফুলস্পীডেই আসছে সেটা, তবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না কোন্ দিকে যাবে–উত্তরে না দক্ষিণে। এই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল তিনজন।

মরিসের কথা হলো, 'আমার ধারণা, জাহাজটা প্রণালীর দিকে আসবেই না।'

দেখা গেল তার কথাই ঠিক হতে যাচ্ছে। পাল-তোলা জাহাজটা আকারে বিশাল। আন্দাজ করা হলো, কম করেও

আঠারোশো টন ভার বইতে পারে। গোটা আমেরিকায় এত দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ খুব বেশি নেই।

বাস্‌কেথ বলল, 'ওটা যদি নিউ ইংল্যান্ডের জাহাজ না হয়, টেলিস্কোপের ওপর আমার আস্থা থাকবে না।'

'ক্যাপটেন কি তার জাহাজের নম্বরটা আমাদেরকে জানাবেন?' জিজ্ঞেস করল মরিস। 'তোমার কি ধারণা?'

রক্ষীদের প্রধান বাস্‌কেথ বলল, 'জানানোই তো উচিত। এটা তাঁর কর্তব্য।'

জাহাজের ক্যাপটেন তাঁর কর্তব্য ঠিকমতই পালন করলেন। একটু পরই দেখা গেল জাহাজের ওপর পত পত করে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ উড়ছে। ওটার নামও জানা গেল—মনডাঙ্ক। রওনা হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার বোস্টন বন্দর থেকে। আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ওরাও পাল্টা সংকেত দিল। ধীরে ধীরে স্টাটেন আইল্যান্ডের দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে মানডাঙ্ক। এক সময় ওয়েবস্টার অন্তরীপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, ওরা তিনজন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জাহাজটার দিকে। বিড়বিড় করে শুভেচ্ছা জানাল বাস্‌কেথ, 'মানডাঙ্ক, তোমার যাত্রা শুভ হোক। ঈশ্বর, তুমি মানডাঙ্ককে কেপ হর্নের ঝড়ের মধ্যে ফেলো না।'

পরবর্তী কয়েক দিন আবার খালি থাকল দিগন্ত। শুধু পুবদিকে, বহু দূরে, পাল-তোলা দু'একটা...না, জাহাজ নয়, ওই শুধু পালই দেখা গেল। তারপর কিছু জাহাজকে যেতে দেখা গেল স্টাটেন আইল্যান্ডের দশ মাইল দূর দিয়ে। এই জাহাজগুলো এদিকে আসবে না বা থামবে না—বাস্‌কেথের ধারণা, ওগুলো অ্যান্টার্কটিকায় মাছ ধরতে যাচ্ছে। আরও কিছু ছোট আকৃতির

জাহাজ চোখে পড়ল, আসছে নিরক্ষরেখার ওদিক থেকে। সেগুলোও কাছাকাছি এল না। পয়েন্ট সেভারেল হয়ে, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে হারিয়ে গেল।

বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত খাতায় লিখে রাখার মত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটল না। আবহাওয়া একটু একটু করে বদলাচ্ছে। আগে উত্তর-পুবে বাতাস বইছিল, এখন বইছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। কয়েকটা ঝড়ও উঠল, তবে জোরালো নয় একটাও।

একুশে ডিসেম্বর সকালে মুখে পাইপ গুঁজে হাঁটাহাঁটি করছে ফিলিপ, হঠাৎ সাগরের তীর ঘেঁষা জঙ্গলে একটা জানোয়ার দেখতে পেল। পুরো দেহটা দেখেনি, শুধু তার মুখ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সচেতন হয়ে তাকিয়ে থাকার পর আর কিছু দেখতে পেল না। কয়েক মিনিট পর টেলিস্কোপ রুমে চলে এল সে। টেলিস্কোপে চোখ লাগাতে জন্তুটিকে আবার দেখতে পেল। হ্যাঁ, ওটা একটা গুআনাকোই। ফিলিপের হাত নিশপিশ করে উঠল। গুলি করার এই সুযোগ কি ছাড়া উচিত?

গলা ছেড়ে বাস্‌কেথ আর মরিসকে ডাকল সে। চিৎকার শুনে তখুনি ছুটে এল তারা। সব শুনে ওরাও তার সঙ্গে একমত হলো, এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। হরিণটাকে মারতে পারলে মুখের স্বাদ বদল করা যায়। টিনের খাবার খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে।

দ্রুত একটা প্ল্যান করা হলো। উপসাগরের দিকে যাবার পথে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ফিলিপ। বন্দুক হাতে গুআনাকোকে ধাওয়া করবে মরিস। অবশ্য খুবই সাবধানে, পা টিপে টিপে যেতে হবে তাকে তা না হলে হরিণটা ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে।

কাছাকাছি পৌঁছে ওটাকে ফিলিপের দিকে ছোটানোর চেষ্টা করবে সে।

বাস্‌কেথ দু'জনকেই সাবধান করে দিল। 'ভুলো না যে এই হরিণগুলোর ইন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একবার যদি কোন রকমে দেখে ফেলে বা গায়ের গন্ধ পায়, এমন ছোটাই ছুটবে যে কার সাধ্য তাকে ধরে। তখন এমন কি গুলি করেও কোন লাভ হবে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, মনে থাকবে,' বলল মরিস।

বাস্‌কেথ আবার টেলিস্কোপে চোখ লাগাল। দেখাদেখি ফিলিপও। আশ্চর্যই বলতে হবে, হরিণটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই এখনও দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়েনি।

'যাও, তাড়াতাড়ি যাও তোমরা,' তাগাদা দিল বাস্‌কেথ। 'ওটা আমাদের গুলি খাবার অপেক্ষায় নড়ছে না!'

ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল মরিস আর ফিলিপ।

বাতিঘর থেকে বাস্‌কেথ দেখল, জঙ্গলের দিকে হাঁটছে মরিস। একটু পর জঙ্গলের ভেতর ঢুকল সে। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। বাস্‌কেথের মনে হলো, আড়াল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে হরিণটার পিছনে ঠিকই পৌঁছাতে পারবে মরিস। তারপর ধাওয়া করলে ওটা ছুটে আসবে ফিলিপের দিকে। ফিলিপও ইতিমধ্যে উপসাগরে যাবার পথটার ওপর পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, জঙ্গল থেকে মরিস বেরুচ্ছে না। হরিণটা সেই আগের মতই স্থির দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়ছে না। দূর থেকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না, তবে মনে হলো চওড়া

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। খানিকটা করুণা বোধ করল বাস্‌কেথ। হরিণটার ভাগ্যই আসলে খারাপ। তা না হলে বিশ্রাম নেয়ার আর জায়গা পেল না। কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশি হতে চলেছে, মরিসকে দেখা যাচ্ছে না কেন? আড়াল থেকে সুযোগ পাচ্ছে যখন, গুলি করে হরিণটাকে ফেলে দিলেই তো পারে!

এদিকে বাস্‌কেথ, ওদিকে ফিলিপ, দু'জনেই গুলির শব্দ শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, কোন গুলি হচ্ছে না। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, হঠাৎ গুঅনাকোটা একটা পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মরিস। সোজা হেঁটে এসে হরিণটার কাছাকাছি থামল সে। তার ভাব দেখে মনে হলো, বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে হরিণটাকে। তারপর কি হলো কে জানে, হঠাৎ হরিণটার দিকে পিছন ফিরে খিঁচে দৌড় দিল। দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করে ডাকছে বাস্‌কেথ ও ফিলিপকে।

বাতিঘর থেকে বাস্‌কেথও চিৎকার করে ডাকল ফিলিপকে। 'ফিলিপ, ফিরে এসো! নিশ্চয়ই অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে!'

বাতিঘর থেকে বেরিয়ে ছুটছে বাস্‌কেথ। ফিলিপও ছুটে ফিরে আসছে। একটু পরই তিনজন এক হলো। মরিস রীতিমত হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

বাস্‌কেথ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, মরিস? কি হয়েছে তোমার? ওখানে তুমি কি দেখলে? হরিণটা হঠাৎ ওভাবে পড়ে গেল কেন?'

'কি হয়েছে আমার সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে,' বলে ঘুরল

মরিস, আবার ছুটল।

তার পিছু নিয়ে ওরা ছুটছে। একটু পরই হরিণটার কাছে চলে এল তিনজন। আঙুল তাক করে মরিস বলল, 'দেখো!'

ফিলিপ বলল, 'দেখার কি আছে? হরিণটা পড়ে আছে। তারমানে নিশ্চয়ই মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, মারাই গেছে। তবে...'

'তবে কি?' জিজ্ঞেস করল বাস্‌কেথ। 'নিশ্চয়ই হার্টফেল করেছে, তাই না? বুড়ো হয়ে গিয়েছিল...'

'না। হার্টফেল করেনি।' মরিস এখনও হাঁপাচ্ছে, তবে পরিশ্রমে নয়, উত্তেজনায়। 'আমি কি বলতে চাইছি বোঝার চেষ্টা করো তোমরা। হরিণটার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। ওটাকে কেউ হত্যা করেছে।'

'হত্যা করেছে? কি বলছ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!'

'না, মাথা খারাপ হয়নি,' বলল মরিস। 'তার প্রমাণ, ওই দেখো গুলির দাগ।'

'গুলি!' আঁতকে উঠল বাস্‌কেথ। বিস্ময়ে চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল তার। ভয়ে মুখটা শুকিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, গুলি করেই মারা হয়েছে ওটাকে। এবং গুলিটা আমি করিনি।'

হরিণটাকে আরও ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বাস্‌কেথ ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! গুলিরই তো দাগ। ওহ্, গড! এর মানে কি?'

ওরা দু'জন তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

গলা আরও খাদে নেমে গেল বাস্‌কেথের। 'এর মানে দ্বীপে

আরও লোক আছে। সে-ই শিকার করেছে এই হরিণটা। কিন্তু কে সে? সে না তারা?' কথা শেষ করে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল।

তিন

ওরা তিনজন একবার যদি স্টাটেন আইল্যান্ডের পশ্চিম দিকটা ঘুরে দেখে আসত তাহলে বুঝতে পারত যে এখানে উপকূল রেখা কি রকম বিপজ্জনক। সৈকত বলতে প্রায় কিছুই এদিকে নেই, অকস্মাৎ সাগর থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে সারি সারি খাড়া পাহাড়। দ্বীপের আর সব দিকে পরিস্থিতি যখন শান্ত, এদিকে সে-সময় ঢেউ আর ঘূর্ণির ভয়ঙ্কর দাপট। প্রতিটি পাহাড়ের গায়ে মুখ ব্যাদান করে আছে অন্ধকার গুহা, নেমে গেছে বোধহয় সেই একেবারে পাতালে। গুহার মুখে, চারপাশে, ছোটখাট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে পাথরের স্তূপ। এখান থেকে দ্বীপের মাঝখানে অর্থাৎ সমতলভূমিতে যেতে হলে কম করেও দু'হাজার ফুট উঁচু পাহাড়চূড়া টপকাতে হবে, আর পাড়ি দিতে হবে পনেরো মাইল দুর্গম পথ। সমুদ্র এখানে এতটাই উগ্র যে এদিকটাতেও একটা বাতিঘর থাকা উচিত ছিল। আশা করা যায় আগে হোক পরে হোক তার প্রয়োজনীয়তা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারবে চিলি

সরকার, তারাও আর্জেন্টিনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একদিন এখানে একটা বাতিঘর তৈরি করবে।

স্টাটেন আইল্যান্ডের দু'দিকে দুটো বাতিঘর থাকলে জলদস্যুদের খুব অসুবিধে হয়ে যাবে। যারা খবর রাখে তারা জানে যে এদিকের সমুদ্রে প্রকৃতির আক্রোশে যত না জাহাজডুবি ঘটে তারচেয়ে অনেক বেশি ঘটে বোম্বেটে অর্থাৎ জলদস্যুদের নিষ্ঠুরতায়। এদিকের জলপথে বোম্বেটেদের উৎপাত রীতিমত ভয়াবহ।

বেশ কয়েক বছর আগেই ইগোর উপসাগরে ঢোকার মুখে জলদস্যুদের একটা দল নিজেদের আস্তানা তৈরি করেছে। গা ঢাকা দেয়ার জন্যে একটা গুহাকে বেছে নিয়েছে তারা। স্টাটেন আইল্যান্ডে ভুলেও কোন জাহাজ আসে না, কাজেই দ্বীপটা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। জলদস্যুরা সংখ্যায় বারোজন। সর্দারের নাম কনগ্রে। কনগ্রের প্রধান শিষ্যের নাম সেরেসান্তে। ওরা সবাই দক্ষিণ আমেরিকার লোক। চার কি পাঁচজন আর্জেন্টিনা বা চিলি থেকে এসেছে, বাকি সবাই টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর লোক। শুরুতে এরা কেউ জলদস্যু ছিল না, কনগ্রেই তাদেরকে ফুসলে এই পথে এনেছে।

সেরেসান্তে নিজেকে চিলির বাসিন্দা বলে দাবি করে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না চিলির কোন্ গাঁয়ে তার জন্ম বা কোন্ পরিবার থেকে এসেছে। তার বয়েস চল্লিশ, মাঝারি গড়ন, গায়ে দানবের মত শক্তি রাখে, খাটতেও পারে গাধার মত। দলের সবাই জানে দুনিয়ায় এমন কোন কুকর্ম নেই যা সেরেসান্তে করতে পারে না।

সর্দার কনগ্রে সম্পর্কে কোন তথ্যই কেউ জানে না। তাকে

একটা মূর্তিমান রহস্যই বলা যায়। কোত্থেকে এল সে, কোথায় তার বাড়ি, এ-সব তথ্য কাউকে কোনদিন সে জানায় না। আসলেই তার নাম কনগ্রে কিনা, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে।

সমুদ্রের এদিকটায় কনগ্রে বাহিনীর কুকীর্তির কথা গোপন কোন বিষয় নয়, অনেকেই জানে। অত্যন্ত বেপরোয়া টাইপের মানুষ সে। একাই দশজন লোকের শক্তি রাখে গায়ে। তার সম্পর্কে বলা হয়, জলদস্যু না হয়ে যদি অন্য কোন পেশা বেছে নিত, তাতেও খুব নাম করত সে। কিন্তু জলদস্যুর জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে কনগ্রে। আপাদমস্তক বোম্বেটে লোকটা, সব রকম অপরাধেই হাত পাকিয়েছে। বলা হয় দস্যু বৃত্তিতে তার সঙ্গে পাল্লা দিলে ওয়ালটার র‍্যালে বা ফ্রান্সিস ড্রেকও হেরে যেতেন। কেন কিভাবে কনগ্রে তার সাগরেদদের নিয়ে এই দ্বীপে আশ্রয় নিল, সেটা খুব সংক্ষেপেই বর্ণনা করা সম্ভব।

ম্যাগেলান প্রণালীর প্রধান বন্দরে দীর্ঘদিন সন্ত্রাস চালিয়েছে এই মানিকজোড়–কনগ্রে আর সেরেসান্তে। এমন সব অপরাধ সেখানে করেছে তারা, বিচার হলে কয়েকবার ফাঁসিতে ঝোলার কথা। এই ফাঁসিতে চড়ার ভয়েই পালিয়ে টিয়েরা ডেল ফুয়েগোয় চলে আসে তারা। ওখানে পৌঁছে শুনতে পায়, সমুদ্রের এদিকটায় ঘন ঘন জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে। শুনে তারা ধরে নিল স্টাটেন আইল্যান্ডের চারধারে ভাঙা জাহাজ আর জাহাজের দামী সব মাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে, শুধু কুড়িয়ে ঘরে তোলার অপেক্ষা। লোভে চকচক করে উঠল কনগ্রের চোখ। দু'জন মিলে তাড়াতাড়ি একটা বাহিনী তৈরি করে ফেলল। খুনী-বদমাশ বেছে বেছে দল গঠন করল তারা। তারপর রওনা হলো একটা জেলে নৌকা নিয়ে।

লেময়র প্রণালী পাড়ি দেয়ার সময় কলনেট অন্তরীপের পাহাড়ে লেগে ওদের নৌকাটা ভেঙে যায়। সাঁতরে কোন রকমে প্রাণ বাঁচায় জলদস্যুরা। ওখান থেকে ইগোর উপসাগরের কাছে আসতে হয়েছে পায়ে হেঁটে। অবশ্য পৌঁছাবার পর হতাশ হতে হয়নি। সান হুয়ান অন্তরীপ থেকে সেভারেল পয়েন্ট পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল জাহাজডুবির দামী দামী জিনিস-পত্র, সেগুলো বিনা বাধায় দখল করে তারা। অসংখ্য লোহার সিন্দুক পায়, ভেতরে ছিল তাল তাল সোনা আর রুপো। পিস্তল, বন্দুক, গোলাবারুদ, এ-সবও প্রচুর পরিমাণে পায়। তারপর তারা সান হুয়ান অন্তরীপের ওপর নজর রাখার জন্যে ডান দিকে সরে আসে। সেখানে গোটা বাহিনীর থাকার উপযোগী একটা গুহা আবিষ্কার করে তারা। উঃ সাগরের উত্তরে একটা টিলার পিছনে গুহাটা, তাই ঝড়ের ছোবল স্পর্শ করতে পারে না। ওই গুহাতেই তারা লুঠ করা সমস্ত জিনিস-পত্র নিয়ে আসে। সঙ্গে করে আরও আনে খাবারদাবার ও বিছানা। ধন-রত্ন পরে সরিয়ে ফেলা হয় কাছাকাছি অন্য একটা গুহায়। কনগ্রের উদ্দেশ্য, ভাল একটা জাহাজ অক্ষত অবস্থায় দখল করতে পারলে সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে চলে যাবে। তার দস্যু জীবনের হাতেখড়ি হয়েছে এদিকে, তাই এলাকাটার ওপর অদ্ভুত এক মায়া জন্মে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাল কোন জাহাজ দখল করতে না পারায় স্টাটেন আইল্যান্ড ছেড়ে অন্য কোথাও সে চলে যেতে পারছে না।

গত দু'বছর ধরে লুঠপাট চালাচ্ছে তারা। ধনভাণ্ডার ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে উঠেছে। জাহাজডুবি থেকেই বেশি লাভবান হয়েছে দলটা। তবে সুযোগ পেলে হিংস্র ডাকাতি করতেও পিছিয়ে

থাকেনি। ডাকাতি করার সময় দয়া ও ধর্ম সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয় কনগ্রে আর তার দলের সদস্যরা, যাকে সামনে পায় তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

দিনে দিনে ধন-সম্পদের পরিমাণ শুধু বাড়ছেই। প্রশ্ন হলো, এত সম্পদ তারা ভোগ করবে কবে? এ নিয়ে প্রায়ই সেরেসান্তের সঙ্গে আলোচনা করে কনগ্রে।

'আর কতদিন অপেক্ষা করব, সেরেসান্তে?'

'জাহাজ না পেলে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ই বা কি।'

কনগ্রে চিন্তিত হয়।

সেরেসান্তে বলে, 'রসদও কিন্তু একদিন ফুরিয়ে যাবে, ওস্তাদ। মাছ ধরে আর শিকার করে কিছুদিন হয়তো চলা যাবে, কিন্তু তারপর? এখানে তো আর চিরকাল আমরা থেকে যেতে পারি না। শীতের কথা মনে হলেই ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে আসে।'

কনগ্রে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছে, 'হ্যাঁ, এখান থেকে যাবার একটা ব্যবস্থা এবার না করলেই নয়।'

তারপর ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে একটা ঘটনা ঘটল। যা কখনও ঘটে না হঠাৎ তাই ঘটল আর কি। একটা জাহাজ এসে ভিড়ল স্টাটেন আইল্যান্ডে। জাহাজটার মাস্তুলে পতপত করে আর্জেন্টিনার পতাকা উড়ছে। জলদস্যুরা দেখেই চিনতে পারল, ওটা একটা যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধজাহাজ দেখে ভয় পেয়ে যায় কনগ্রে। দল নিয়ে গুহার ভেতর লুকিয়ে পড়ে সে। তার আগে নিজেদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন সযত্নে মুছে ফেলতে ভোলেনি। শুরু হলো অপেক্ষার পালা, জাহাজটা কখন দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়।

বলাই বাহুল্য, জাহাজটি ছিল সান্তা ফে। বাতিঘর তৈরি করা

হবে, সেজন্যেই দ্বীপটা দেখতে এসেছিলেন ক্যাপটেন লাফায়েত। সেবার মাত্র দিন কয়েক ছিল জাহাজটা। বাতিঘর কোথায় তৈরি করা হবে সেটা ঠিক করেই ফিরে গেল আবার।

জলদস্যুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাদের অস্তিত্ব জাহাজের কারও চোখে ধরা পড়েনি। সাহস করে গুহা থেকে একবার বেরিয়েছিল সেরেসান্তে, আড়াল থেকে নাবিকদের দু'চারটে কথাবার্তা শুনেছে। তা থেকেই তারা জানতে পারল যে সান্তা ফে কি কারণে স্টাটেন দ্বীপে নোঙর ফেলেছিল।

ইগোর উপসাগরে একটা বাতিঘর বানানো হবে।

জলদস্যুরা চিন্তায় পড়ে গেল। বাতিঘর তৈরি করা হলে এই দ্বীপে তো আর তাদের থাকা চলবে না। কিন্তু এই দ্বীপ ছেড়ে তারা এখন যাবেই বা কিভাবে? যাবার আগে অন্য কোথাও একটা আস্তানা তো তৈরি করা দরকার, তাই না? যেতে হলে জাহাজও তো লাগবে একটা! কিন্তু সেই জাহাজ ওরা পাচ্ছে কোথায়?

অনেক ভেবেচিন্তে আপাতত স্টাটেন আইল্যান্ডে থেকে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল কনগ্রে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে অন্য একটা গুহা বের করল, সমস্ত ধন-সম্পদ সরিয়ে নিয়ে এল সেখানে। গুহাটা দ্বীপের পশ্চিম দিকে, অত্যন্ত দুর্গম এলাকায়। প্রায় বছরখানেক চলার মত রসদ-পত্রও সঙ্গে করে নিয়ে এল তারা। ঘাঁটি বদলের কাজটা খুব ব্যস্ততার সঙ্গেই সারা হলো। কারণ সেরেসান্তে জানতে পেরেছে, বাতিঘর তৈরির জন্যে প্রচুর লোকজন নিয়ে আবার ফিরে আসবে সান্তা ফে। তাড়াহুড়ো করলেও, দুটো গুহার সব জিনিস সরিয়ে আনার সময় পাওয়া গেল না। একটা গুহায় প্রচুর জিনিস রয়ে গেল। তবে সেটার মুখ বাইরে থেকে পাথর ফেলে বন্ধ করে দিয়ে এল।

নতুন গুহায় আশ্রয় নিল জলদস্যুরা। কয়েক দিন পর বাতিঘর তৈরির উপকরণ আর লোকজন নিয়ে আবার ফিরে এল সান্তা ফে। বাধ্য হয়েই দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় থাকতে হচ্ছে কনগ্রেকে। কাছাকাছি একটা ঝর্ণা থাকায় পানির কোন অভাব হচ্ছে না শুরু হলো অপেক্ষার পালা, কবে বাতিঘর তৈরির কাজ শেষ হবে। কাজ সেরে সান্তা ফে ফিরে গেলে কনগ্রে তার কুকর্মে হাত দিতে পারে।

কনগ্রে আর সেরেসান্তে ধারণা করল, ডিসেম্বরের দিকে কাজটা শেষ হবে। সময়টা আন্দাজ করার পর মনে মনে কুমতলব আঁটল কনগ্রে। বাতিঘর বানানো শেষ হলে অল্প দু'চারজন রক্ষীকে রেখে সান্তা ফে ফিরে যাবে। তখনই কিছু একটা করবে সে। পাহাড় চূড়ায় লোক রাখা হলো, বাতিঘরের আলো জ্বললে খবর দেবে।

ডিসেম্বরের নয় তারিখে খবর এল, বাতিঘরের আলো জ্বলছে।

কয়েকটা দিন কিছুই ঘটল না। তারপর একদিন সেরেসান্তে একটা হরিণকে গুলি করল। গুলি খেয়ে ছুটতে শুরু করে সেটা। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। বাতিঘরের রক্ষীরা হরিণটাকে দেখে ফেলায় সেরেসান্তে আর এগোতে পারেনি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বাতিঘরের একজন রক্ষী হরিণটার কাছে চলে আসে।

ওই ঘটনার ফলেই রক্ষীরা জেনে গেল যে দ্বীপে তারা ছাড়াও অন্য লোক আছে। যেহেতু তারা সামনে আসছে না, আড়ালে লুকিয়ে থাকছে, কাজেই ধরে নিতে হবে তারা অবশ্যই ভাল লোক নয়। বাস্‌কেথ তার সহকারীদের সাবধানে থাকতে বলল।

ওদিকে কনগ্রে ফন্দি এঁটেছে, বাইশে ডিসেম্বরে বাতিঘর দখল করে নেবে তারা। বাইশে ডিসেম্বর রওনা হবে, ইগোর উপসাগরে পৌঁছাবে চব্বিশ তারিখে মানে বড়দিনের আগের সন্ধ্যায়।

আলোকরক্ষী মাত্র তিনজন, ওদেরকে খুন করতে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হবে না। বাতিঘর দখল করার পর আগের গুহায় মাল-পত্র সরিয়ে নিতে পারবে তারা।

বাইশে ডিসেম্বর এসে গেল। সন্ধের দিকে গুহার সামনে হাঁটছে কনগ্রে আর সেরেসান্তে, দু'জনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর বোলাচ্ছে সমুদ্রের ওপর। আজকের আবহাওয়া খুব একটা শান্ত নয়। দিগন্তে মেঘ জমেছে। জোরালো বাতাস বইছে উত্তর-পুবে। জলদস্যুরা রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে।

'আমরা তাহলে এখানকার সব মাল-পত্র ফেলে রেখেই যাচ্ছি, কেমন?' জিজ্ঞেস করল সেরেসান্তে।

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল। ওগুলো পরে নিয়ে যাওয়া হবে। বাতিঘরটা দখল করার পর...,' কথাটা কনগ্রে শেষ করতে পারল না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, কিছু একটা দেখে চমকে উঠেছে। এক সেকেন্ড পরই চেঁচাতে শুরু করল, 'সেরেসান্তে! দেখো! ওদিকে তাকাও!'

কনগ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেরেসান্তে তাকাল। পরমুহূর্তে সে-ও চেঁচিয়ে উঠল, 'ওহ্, গড! জাহাজ! চোখের ভুল নয়, সত্যি এটা একটা জাহাজ!'

'ভাল করে দেখে বলো,' তাগাদা দিল কনগ্রে। 'কি মনে হচ্ছে? এদিকেই আসছে তো?'

'হ্যাঁ, আসছে বলেই মনে হচ্ছে, ওস্তাদ,' গলাটা উত্তেজনায় কেঁপে গেল সেরেসান্তের। 'সম্ভবত একটা স্কুনার, ওস্তাদ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল কনগ্রে। 'ঠিক ধরেছ। দেড় থেকে দুশো টনের মধ্যে একটা স্কুনারই।'

জলদস্যুরা গুহার সামনে জড়ো হয়েছে। তাদেরকে কনগ্রে

বলল, 'এই সুযোগ আমরা হারাতে পারি না। আমরা একটা জাহাজ খুঁজছিলাম। ওটাই সেই জাহাজ। দেখো, দেখো—বাতাস আর জোয়ারের সঙ্গে কেমন লড়ছে জাহাজটা! বোঝাই যাচ্ছে, অত্যন্ত মজবুত। ওটাই আমাদের চাই। তোমরা কি বলো, অ্যাঁ?'

সবাই সমস্বরে জবাব দিল, 'আপনার কথাই শিরোধার্য, ওস্তাদ! আমরা আবার কি বলব!'

রাত গাঢ় হলো। জাহাজটার পক্ষে এখন আর প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

'কালও ওটাকে অন্তরীপের দিকে এগোতে দেখব আমরা,' বলল কনগ্রে। 'তখন দেখা যাবে আমরা ওটাকে নিয়ে কি করতে পারি।'

এক ঘণ্টা পর অন্ধকারে হারিয়ে গেল জাহাজটা। এমন কি জাহাজটার কোন আলোও ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

পরদিন ভোরে জলদস্যুরা গুহা থেকে বেরিয়ে দেখল সেইন্ট বার্থোলোমিউ অন্তরীপের একটা পাহাড় ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুনারটা।

চার

জলদস্যুরা অবাক। স্কুনারটা এখানে কেন থামল? কাল খুব ঝড়ো বাতাস ছিল, সেই বাতাসের কাছে হার মেনে সাময়িক আশ্রয়

নিয়ে থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঝড়ো বাতাস থেমে যাবার পর খোলা সাগরে বেরিয়ে যায়নি কেন? ধীরে ধীরে তারা রহস্যটা বুঝতে পারল। স্কুনারের নাবিক আর ক্রুরা কি কম চেষ্টা করেছে! কিন্তু শত চেষ্টাতেও জাহাজটাকে নড়াতে পারেনি। পারবে কিভাবে, চড়ায় আটকা পড়েছে যে!

আটকা পড়া জাহাজের ক্যাপটেন আর মাঝি-মাল্লাদের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়, তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাতের অন্ধকারে জাহাজ পাহাড়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে, এই ভয়ে সবাই তারা নৌকায় উঠে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছে? এরকম সত্যি যদি ঘটে থাকে, ব্যাপারটাকে নিয়তির পরিহাস বলা ছাড়া উপায় কি! জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি, অর্থাৎ জাহাজে তারা থেকে গেলেই পারত!

ওদের ধারণা যে সত্যি একটু পর তার প্রমাণ পাওয়া গেল। জলদস্যুরা দেখল মাইল দুয়েক উত্তর-পুবে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করছে একটা নৌকা। প্রবল বাতাসে প্রায় উল্টে যাবার অবস্থা। ছুটে চলেছে ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরের দিকে। আচ্ছা, লোকগুলো এখনও তাহলে পটল তোলেনি!

জোয়ার প্রবল হয়ে উঠলেও স্কুনারের কাছে পৌঁছানো জলদস্যুদের জন্যে কঠিন হবে না। মাত্র তো আধ মাইল দূরত্ব। কয়েকটা টিলা আর বালিয়াড়ি পেরুনো এমন কি শক্ত কাজ। সময় নষ্ট না করে পৌঁছে গেল তারা।

উঁচু একটা বালির চড়ায় আটকা পড়েছে স্কুনার। জোয়ার শুরু হোক, পানি সাত-আট হাত ফুলে উঠুক, তখন জাহাজটাকে চড়া থেকে সরিয়ে আনা বা চালিয়ে আনা কোন সমস্যাই হবে না। কনগ্রের হিসাবে কোন ভুল নেই, জাহাজটা আসলেও একশো ষাট

টনী। ওটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিল কনগ্রে। গায়ে নাম লেখা রয়েছে, পড়ল সে–মউল, ভালপারাইসো।

তারমানে এটা চিলির জাহাজ।

'এটাই আমাদের দরকার, কি বলো, ওস্তাদ?' জিজ্ঞেস করল সেরেসান্তে।

'হ্যাঁ, মন্দ নয়,' শিষ্যদের কেউ একজন মন্তব্য করল। 'তবে দেখতে হবে তলাটা ফুটো হয়ে গেছে কিনা।'

'হোক না ফুটো, মেরামত করে নিতে কতক্ষণ,' বলল কনগ্রে। স্কুনারটা হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে।

জাহাজটা একটু কাত হয়ে আছে, উঠতে বেশ খানিকটা ঝামেলা পোহাতে হলো। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সব কিছুই অটুট আর অক্ষত রয়েছে। ক্যাপটেনের কেবিনে ঢুকে অনেকগুলো দেরাজ হাতড়ে জাহাজ সম্পর্কিত এক গাদা কাগজ-পত্র বের করে আনল কনগ্রে। সেগুলোর মধ্যে লগবুকও রয়েছে। ওগুলো নাড়াচাড়া করে স্কুনারটা সম্পর্কে যা কিছু জানার সব তারা জেনে নিল।

স্কুনার মউল রওনা হয় চিলির ভালপারাইসো বন্দর থেকে। কার্গো বহনের ক্ষমতা একশো সাতান্ন টন। দু'জন নাবিক আর সারেঙকে নিয়ে ক্যাপটেন ফকল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ২৩ শে নভেম্বর। কেইপ হর্ন অন্তরীপকে পাশ কাটাতে মউলের কোন সমস্যাই হয়নি। বিপত্তি ঘটেছে লেময়র প্রণালীতে ঢোকার সময়। স্টাটেন আইল্যান্ডের বালিয়াড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

জাহাজের ভেতরটা একদম ফাঁকা, মাল-পত্র বলতে কিছুই নেই। সেজন্যে অবশ্য কনগ্রের কোন দুঃখ নেই। দ্বীপ ছেড়ে

পালাবার উপযোগী একটা জাহাজ পেয়েই খুশি সে। এখন তার একমাত্র কাজ বালিয়াড়ি থেকে জাহাজটাকে উদ্ধার করে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া।

জোয়ার শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। ডান হাত সেরেসান্তেকে কনগ্রে বলল, 'জোয়ার শুরু হবার আগেই নিশ্চিত হতে হবে মউল পানিতে ভাসার উপযোগী আছে কিনা। মেরামতির কাজ থাকলে আগেই সেরে ফেলা দরকার।'

'জাহাজ জখম হয়ে থাকলে জোয়ার শুরু হলেই তা জানা যাবে, ওস্তাদ,' বলল সেরেসান্তে। 'জোয়ারের পানিতে যদি ভেসে ওঠে, সব সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যাবে। আর না ভাসলে বোঝা যাবে কেন ভাসছে না, তখন কোথায় কি মেরামত লাগে দেখব। আমাদের আর কি কাজ তাই বলো।'

'তবু আগে থেকে সাবধান হতে তো দোষের কিছু নেই। যদি ভাসে, আমাদের প্রথম কাজ হবে ওটাকে গুহার কাছে নিয়ে যাওয়া। ওদিকের পানি যথেষ্ট গভীর।'

'তারপর?'

'এত দিন ধরে আমরা প্রচুর ধনরত্ন জমিয়েছি, সব ওই জাহাজে তুলতে হবে।'

'তারপর?'

'তারপর কি করা হবে পরে বলব।' নিজের প্ল্যানটা এখুনি ফাঁস করতে রাজি নয় কনগ্রে।

সেরেসান্তের নির্দেশে জলদস্যুরা কাজ আরম্ভ করে দিল জোয়ার শুরু হবার আগেই। কাজ মানে স্কুনারটাকে সাগর পাড়ি দেয়ার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। পানি ফুলতে শুরু করার আগেই শেষ হলো তা। জোয়ারের আর দু'একটা তোড় এলেই বালিয়াড়ি

পানির নিচে তলিয়ে যাবে। কনগ্রে আর সেরেসান্তে ছয়জন জলদস্যুকে নিয়ে স্কুনারে রয়ে গেল। বাকি সবাই পায়ে হেঁটে গুহায় ফিরে যাচ্ছে।

কনগ্রের ভাগ্যটা সত্যি ভাল। ভরা জোয়ারে বালিয়াড়ির ফাঁদ থেকে মুক্তি পেল মউল, আর সেই সঙ্গে তার পালে লাগল হঠাৎ শুরু হওয়া জোরালো বাতাস। কনগ্রে কল্পনাও করেনি ভাগ্য তাকে এতটা সাহায্য করবে।

তবে উদ্বেগ একটা থেকেই গেল। স্কুনারের খোলের তলায় কোন ফুটো তৈরি হয়নি তো? ফুটো থাকলে সাগর আর পাড়ি দিতে হবে না, সবাইকে নিয়ে ডুবে মরতে হবে এখানেই। রেইলিঙে ভর দিয়ে জোয়ারের ফুলে ওঠা পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জলদস্যুরা। তবে না, বিপদের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না এখনও। কাত হয়ে থাকা জাহাজ ধীরে ধীরে সিধে হলো। উল্লাস চেপে রাখতে না পেরে কনগ্রে চেঁচিয়ে উঠল, নেই! জাহাজে কোন ফুটো নেই!'

জোয়ার শুরু হয়েছে আড়াই ঘণ্টা হলো। এতক্ষণে বুঝি ফাঁদ থেকে পুরোপুরি ছাড়া পেয়ে পানিতে ভাসছে মউল। উত্তেজনায় কাঁপা গলায় নির্দেশ দিল কনগ্রে, 'নোঙর তোলো!'

তোলা হলো নোঙর। কিন্তু জাহাজ নড়ছে না। কি ব্যাপার? ব্যাপার বোঝার জন্যে চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখ বোলাচ্ছে সেরেসান্তে। তার চোখে ধরা পড়ল, জাহাজ এখনও পুরোপুরি ভেসে ওঠেনি, খানিকটা অংশ বালিয়াড়িতে আটকে আছে। তবে সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আপনা থেকেই আটকে থাকা অংশটা মুক্ত হলো। সেই সঙ্গে হঠাৎ ঘুরে গেল জাহাজ, মুখ ফেরাল সাগরের দিকে।

উত্তর-পুব আকাশে মেঘ জমেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপের

পশ্চিম দিকে নিয়ে যেতে হবে মউলকে, তা না হলে ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়তে হবে। প্রবল বাতাসে প্রণালীর মধ্যে জাহাজ চালানো সম্ভব হবে না। আবার একটা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল ওদেরকে। পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। একটু পরই তো শুরু হয়ে যাবে ভাটা। পানি সয়ে যাওয়ায় আবার বালিয়াড়ি মাথাচাড়া দেবে। সেই বালিয়াড়ি আবার আটকে ফেলবে জাহাজটাকে।

সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। ছুটোছুটি করে সবার কাজ তদারক করছে কনগ্রে। সবাই মিলে চেষ্টা করছে মউলকে সাগরের দিকে নিয়ে যেতে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করার পর সামান্য একটু নড়ল জাহাজ। কনগ্রে চেঁচিয়ে উঠল, 'মারো জোয়ান, হেইয়ো! আউর ভি থোড়া; হেইয়ো!'

অবশেষে সচল হলো জাহাজ। ছিটকে বেরিয়ে এল গভীর পানিতে। জলদস্যুরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। কনগ্রে ওদেরকে বিশ্রাম নিতে নিষেধ করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মউলকে গুহার সামনে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই বাজিমাত।

জাহাজটাকে কনগ্রে নিজেই চালাচ্ছে। বেশিক্ষণ লাগল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই মউল পৌঁছে গেল গুহার সামনে, পেঙ্গুইন টিলার কাছে। সেরেসান্তেকে নির্দেশ দিল সে, 'নোঙর ফেলো!'

পাঁচ

পেঙ্গুইন টিলার কাছে খাঁড়িতে নোঙর ফেলেছে মউল, তাসত্ত্বেও

খোলা সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না সে। এখন যদি উত্তর-পশ্চিম থেকে ঝড় শুরু হয়, সাংঘাতিক বিপদ হবে। কনগ্রে চিন্তায় পড়ে গেল। ইতিমধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরদিন ভাটার টান শুরু হওয়া মাত্র খাঁড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে জাহাজটাকে। তবে তার আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে জাহাজের কোথাও কোন ফুটো আছে কিনা। খোলা সাগরকে সব সময় শত্রু বলেই মনে করা উচিত, বেরুবার আগে নিশ্চিত হতে হবে শত্রুর হামলা ঠেকাবার মত শক্তি-সামর্থ্য জাহাজটার আছে কিনা।

সেরেসান্তেকে সঙ্গে নিয়ে গোটা জাহাজটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল কনগ্রে। ওদেরকে সাহায্য করল ভার্গাস। ভার্গাস একজন চিলিয়ান, ভালপারাইসোর একটা জাহাজ তৈরির কারখানায় এক সময় কাঠমিস্ত্রির কাজ করত। যে-কোন জাহাজের আঙ্গিক ও কাঠামো সম্পর্কে তার ভাল অভিজ্ঞতা আছে।

পরীক্ষা করে জানা গেল মউল মোটামুটি অক্ষতই আছে। এখানে সেখানে সামান্য ত্রুটি থাকলেও কোনটাই মারাত্মক নয়, তবে সংখ্যায় সেগুলো অনেক। সংখ্যায় বেশি বলেই মেরামত করতে সাত দিন সময় লাগবে বলে মন্তব্য করল ভার্গাস। তারমানে সে বলতে চাইছে, কাল মউলকে এই জায়গা থেকে সরানো যাবে না।

শুনে খুব রেগে গেল কনগ্রে, মুখ খারাপ করে গাল দিল ভাগ্যকে। তার শিষ্য ডাকাতরাও খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে বালিয়াড়ি থেকে মুক্ত করে পেঙ্গুইন টিলার কাছে আনা হলো, অথচ এই মুহূর্তে ওটাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

সেরেসান্তের সঙ্গে আলোচনায় বসল কনগ্রে। তার বক্তব্য মন

দিয়ে শুনল সবাই। সাগর পাড়ি দেয়ার আগে ছোটখাট মেরামতের কাজগুলো অবশ্যই সারিয়ে নেয়া দরকার, বলল সে।

সেরেসান্তে জিজ্ঞেস করল, 'রওনা হবার পর মেরামতের কাজে হাত দিলে ক্ষতি কি?'

মাথা নেড়ে কনগ্রে বলল, 'মউলের যে হাল দেখছি, তার ওপর আস্থা রাখা যায় না। এই করুণ অবস্থার জন্যেই নাবিকরা এটাকে ফেলে রেখে পালিয়েছে। না, সেরেসান্তে, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। প্যাসিফিক আইল্যান্ড কি এখানে! কয়েকশো মাইল দূরে। মেরামত না করে খোলা সাগরে বেরুলে ডুবে মরারই বেশি সম্ভাবনা। সে ঝুঁকি কেন আমরা নিতে যাব!'

ভার্গাস বলল, 'বেশ, মেরামতই আগে করা হোক। কিন্তু মেরামতের কাজটা আমরা করব কোথায়? এখানে, এই ফাঁকা জায়গায়, খাঁড়ির মধ্যে? ভেবে দেখেছেন, যে-কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে? তখন কি হবে?'

চিলির আরেকজন লোক তাকে সমর্থন করে বলল, 'এরকম খোলা জায়গায় জাহাজ মেরামতের কাজে হাত দেয়া উচিত হবে না। মেরামত যদি করতেই হয়, অন্য কোন জায়গায়।'

কনগ্রে তখন বলল, 'বেশ। চলো তাহলে মউলকে ইগোর উপসাগরে নিয়ে যাই।'

সবাই চুপ করে আছে দেখে প্ল্যানটা একটু ব্যাখ্যা করল সে। ইগোর উপসাগরে তার পছন্দ মত জায়গায় মউলকে নিয়ে যেতে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে। প্ল্যানটা শুনে জলদস্যুদের মনে খানিকটা আস্থা আর উৎসাহ ফিরে এল। শুরু হলো প্রস্তুতি, পরদিন জোয়ারের সময় যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় মউলকে নিয়ে পৌঁছানো যায়।

বাতিঘরের রক্ষীদের নিয়ে ওরা কেউ মাথা ঘামাল না। কনগ্রে তার শিষ্যদের জনিয়েছে, 'মেরামতের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, যাত্রা শুরুর আগে, ইগোর উপসাগর নিজেদের দখলে আনব আমরা।'

সে তার এই প্ল্যানটা আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করল সেরেসান্তেকে একা পেয়ে। 'দ্বীপটায় আমরা আর লুকিয়ে থাকছি না। আগের সিদ্ধান্তই বহাল আছে, তবে প্ল্যানটা একটু সংশোধন করেছি।'

'কি সংশোধন, ওস্তাদ?' জানতে চাইল সেরেসান্তে।

'পাহাড় ডিঙিয়ে নয়, সাগরপথেই যাব আমরা–মউলকে নিয়ে। ওখানে পৌঁছে স্বাভাবিকভাবে নোঙর ফেলবে স্কুনার। তাতে করে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না, ধরে নেবে আমরা ভালপারাইসো থেকে আসছি।'

'কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি ভাববে ওরা?'

'ওরা ভাববে সাগরপাড়ি দেয়ার সময় বিপদে পড়ে নোঙর ফেলেছি। কাজেই ওরা আমাদেরকে খাতিরই করবে। তারপর...'

'তারপর, ওস্তাদ?' প্রশ্নটা সেরেসান্তে না করলেও পারত, কারণ সে তার ওস্তাদকে খুব ভালভাবে চেনে, কাজেই জানে তারপর কি ঘটবে।

কনগ্রে চুপ করে থাকল, অপ্রয়োজনীয় মনে করে সেরেসান্তের প্রশ্নের জবাব দিল না। দু'জন মিলে এই যে ষড়যন্ত্র করল তারা, এর সাফল্য সম্পর্কে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই।

যাত্রার প্রস্তুতি নিতেই বিকেল হয়ে গেল। প্রথমে প্রয়োজনীয় রসদ তোলা হলো জাহাজে। তারপর গুহা থেকে সমস্ত মালপত্র বের করে ভরা হলো হোল্ডে। চারটের মধ্যে সব কাজ শেষ,

জাহাজ নোঙর তোলার জন্যে তৈরি।

কনগ্রে নতুন করে হিসাব কষে বলল, গন্তব্যে পৌঁছাতে ত্রিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। রাতে জাহাজ চালানো নিরাপদ নয়, তাই সিদ্ধান্ত হলো কাল সকালে রওনা হবে তারা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। আবহাওয়া এক রকম শান্তই বলা যায়। সূর্য ডোবার পরও, কুয়াশা না থাকায়, আকাশ আর সাগর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধারণা করা হলো রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটবে। জলদস্যুরা বেশিরভাগই জাহাজের খোলা ডেকে রাত কাটাল, দু'একজন ঘুমাল বার্থে। ক্যাপটেনের চেয়ারটা দখল করল কনগ্রে। সেরেসান্তে বসল লেফটেন্যান্টের চেয়ারে। রাত একটু গভীর হতে ডেকে বেরিয়ে এসে বাতাসের গতিগতি পরীক্ষা করে গেল কনগ্রে। না, ঝড়ের কোন আভাস নেই।

ভোরে সূর্য উঠল সোনালি আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত করে দিয়ে। সারা বছরে এরকম সূর্যোদয় খুব কমই দেখা যায়। স্বচ্ছ ও নির্মল আকাশ টলটলে নীল, তাতে যেন নিস্তরঙ্গ সাগর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। একটা নৌকায় চড়ে তীরে নামল কনগ্রে, টিলার মাথায় উঠে চারদিকের সাগরে চোখ বোলাবে। দক্ষিণ দিকে সাগর এমনিতেই শান্ত থাকে, শুধু প্রণালীর প্রবেশমুখে ঢেউগুলোকে খানিকটা উদ্দাম হতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে বাতাস বেশ জোরালো হয়েছে। চারদিকে কোথাও কোন জলযান নেই। মউল রওনা হলে পথে অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই।

পরিবেশ পরিস্থিতি দেখার পর কনগ্রে সিদ্ধান্ত নিল দ্বীপের পশ্চিম তীর দিয়েই গন্তব্যস্থলের দিকে যাবে সে, একে একে ওয়েবস্টার, সেভারেল পয়েন্ট ইত্যাদি অন্তরীপ ঘুরে। টিলা থেকে

নেমে গুহার ভেতর ঢুকল সে, উদ্দেশ্য কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখা।

সাতটার দিকে শুরু হলো ভাটার টান। কনগ্রের নির্দেশে স্কুনারের নোঙর তোলা হলো। বাতাস বইছে উত্তর-পুব থেকে, সেই বাতাসে ভর করে রওনা হলো তারা। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা সাগরে পড়তে দশ মিনিট লাগল। পানি কেটে দ্রুত এগোচ্ছে মউল। আধ ঘণ্টা পর সেইন্ট বার্থোলোমিউর পাহাড় ঘুরে পুবদিকে বাঁক নিল তারা।

মউলের আচরণে খুব খুশি কনগ্রে আর সেরেসান্তে। কনগ্রে বলল, এভাবে এগোতে পারলে সন্ধের আগেই তারা ইগোর উপসাগরের মুখে পৌঁছে যাবে। তবে সেটা তার ইচ্ছা নয়। উপকূলের কোথাও নোঙর ফেলতে চায় সে, গন্তব্যে পৌঁছাবে পরদিন সূর্য ওঠার পর। তার নির্দেশে মউলের গতি কমিয়ে আনা হলো।

সারাদিন সাগরে অন্য কোন জাহাজ দেখা গেল না। সন্ধের ঠিক আগে ওয়েবস্টার অন্তরীপের পুবদিকে পৌঁছাল তারা। যাত্রার প্রথম ভাগ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। তীর থেকে সামান্য দূরে নোঙর ফেলা হলো মউলের।

আবহাওয়া অনুকূল হওয়ায় জলদস্যুদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র সফল হবার ষোলোআনা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাত দশটার দিকে নিস্তেজ হয়ে পড়ল বাতাস। তবে ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে আবার বেশ জোরালো হয়ে উঠল। আকাশে রোদ উঠতেই নোঙর তোলার নির্দেশ দিল কনগ্রে। মউল তার দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু করল।

তবে মউলকে ফুলস্পীডে চালানো হচ্ছে না। যতটা ক্ষমতা

তার মাত্র অর্ধেকটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তীরের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে এগোচ্ছে জাহাজ, তবে সব সময় এক মাইল দূরত্ব বজায় রেখে। এদিককার উপকূল কি প্রকৃতির তা তাদের জানা নেই বলেই সাবধানের মার নেই ভেবে তীর ঘেঁষে যাচ্ছে না।

বেলা দশটার দিকে ব্লসম উপসাগরে পড়ল মউল। এবার উত্তাল সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় থাকল না। সাগর এখানে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। কনগ্রে দক্ষ নাবিক, খুব সাবধানে স্কুনার চালাচ্ছে। বিকেল হলো। কম্পাসের সাহায্যে মাপজোক করল সে। অনুকূল বাতাস পাবার আশায় দিক পরিবর্তন করতে হয়েছে, তাই গন্তব্য ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে সরে এসেছে তারা। জাহাজ ঘুরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল সে। আবার ইগোর উপসাগরের দিকে ফিরে চলল মউল। সেই মুহূর্তে পয়েন্ট সেভারেল তাদের কাছ থেকে মাত্র চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে। আরও দূরে সান হুয়ান অন্তরীপও দেখা যাচ্ছে, যদিও অস্পষ্ট।

এখান থেকেই দেখা গেল দুনিয়ার শেষ প্রান্তের সেই আলোক স্তম্ভের চূড়া। ক্যাপটেনের কামরায় টেলিস্কোপ আছে, সেটায় চোখ লাগিয়ে বাতিঘরটার দিকে তাকাল কনগ্রে। একজন রক্ষীকে দেখা গেল, লণ্ঠন-ঘরে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সূর্য ডুবতে তখনও অনেক দেরি, অন্তত তিন ঘণ্টা। কনগ্রে সিদ্ধান্ত নিল রাত নামার আগেই গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করবে সে।

বলাই বাহুল্য, বাতিঘর থেকে রক্ষীরাও স্কুনারটিকে দেখতে পেয়েছে। প্রথমে ওরা ভাবল, জাহাজটা ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু একটু পরই পরিষ্কার বোঝা গেল, স্টাটেন আইল্যান্ডেই আসছে তারা।

মউলকে রক্ষীরা দেখল কি দেখল না তা নিয়ে কনগ্রের কোন মাথাব্যথা নেই। যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব সফল হতে যাচ্ছে দেখে আনন্দেই আছে সে। তবে এই পর্বের যাত্রাটা ঝামেলামুক্ত নয়। পানির নিচে লুকিয়ে আছে ডুবোপাহাড়ের চূড়া, তার একটায় ঘষা খেলে বা ধাক্কা লাগলে মউল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

গন্তব্যে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই, এই সময় জলদস্যুদের একজন রিপোর্ট করল, জাহাজে একটা ফুটো তৈরি হয়েছে, সেটা দিয়ে পানিও ঢুকছে হু হু করে। না, খুব বড় ফুটো নয়। রিপোর্ট পেয়েই ভার্গাসকে তাড়া লাগাল কনগ্রে। ভার্গাস ছুটল ফুটো বন্ধ করতে। আপাতত কোন রকমে পানি ঢোকা বন্ধ করা হলো, পরে ভালভাবে মেরামত করতে হবে।

সন্ধে ঠিক ছ'টায় ইগোর উপসাগরের মুখে পৌঁছাল মউল। আরও আধ ঘণ্টা পর বাতিঘরের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাগর। এই বাতিঘর মাত্র সেদিন তৈরি হয়েছে, এরইমধ্যে সেটাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে চিলির একটা জাহাজ। বাতিঘরের জীবনে এটাই তো প্রথম জাহাজ। কিন্তু রাস্‌কেথ আর তার সহকারীরা জানে না জাহাজটার মালিক একদল দয়ামায়াহীন জলদস্যু। জানে না তাদের কপালে কি সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা। ধীরে ধীরে তীর লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে স্কুনার মউল।

ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কনগ্রে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে সেরেসান্তে। সে হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের প্ল্যানের প্রথম পর্যায়টা সফল হলো–কি বলো, ওস্তাদ?'

'হ্যাঁ, প্রথম পর্যায়টা সফল হলো।' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল কনগ্রে। 'আশা করি বাকি পর্যায়গুলোও শতকরা

একশো ভাগ সফল হবে।'

বিশ মিনিট পর তীরের কাছাকাছি থামল মউল। নোঙর ফেলার প্রস্তুতি চলছে।

ইতিমধ্যে বাতিঘর থেকে সৈকতে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন রক্ষী--ফিলিপ আর মরিস। গলা চড়িয়ে মউলকে ওরা অভিনন্দন জানাল। রশি খুলে একটা নৌকা নামানো হলো পানিতে, মউলে যাবে। ওদের সঙ্গে বাস্‌কেথ নেই, সে লণ্ঠন-ঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত।

ঘড়ঘড় বিকট আওয়াজ তুলে নোঙর পড়ছে পানিতে, এই সময় মউলের ডেকে পৌঁছাল ফিলিপ আর মরিস। কনগ্রে ইঙ্গিত করতে যা দেরি, চোখের পলকে মরিসের ঘাড়ে চকচকে একটা কুড়াল নেমে এল। বেচারা এতটুকু আওয়াজ করারও সময় পায়নি, ছিটকে পড়ে গেল ডেকের ওপর। পরমুহূর্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল একজোড়া রিভলভার। মরিসের বন্ধু ফিলিপও ডেকের ওপর লুটিয়ে পড়ল গুলি খেয়ে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে ওরা।

কাজে ব্যস্ত ছিল বাস্‌কেথ, হঠাৎ কি মনে করে থামল সে, জানালার সামনে এসে সাগরের দিকে তাকাল। আর ঠিক তখনই গর্জে উঠল একজোড়া রিভলভার। গুলির শব্দ শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। কি ঘটছে চোখের সামনেই দেখতে পেল সে। সহকারীদের এভাবে খুন হতে দেখে বিস্ময়ে শোকে একেবারে পাথর হয়ে গেল সে। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল মনে। জাহাজে চড়ে কারা এসেছে? মরিস আর ফিলিপ তো কোন অপরাধ করেনি, তাহলে ওদেরকে মারল কেন?

চিন্তা করার সময় নেই, আত্মরক্ষার প্রবল তাগাদা অনুভব করল বাস্‌কেথ। ওদের পরিচয় জানা নেই তার, তবে বুঝতে

পারছে ওরা খুনী, ওকেও দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে। ফিলিপ আর মরিসের কথা ভেবে কান্না পাচ্ছে, হতভাগাদের জন্যে কিছুই সে করতে পারল না। এখন কি করলে খুনীদের হাত থেকে বাঁচা যায় বুঝতে পারছে না সে। হতভম্ব হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। চিলির ভালপারাইসো বন্দর থেকে এসেছে লোকগুলো, এসেই কি কারণে নিরীহ দু'জন লোককে একটা কথা পর্যন্ত বলতে না দিয়ে মেরে ফেলল, ব্যাপারটা কোনমতে ওর মাথায় ঢুকছে না।

যেভাবে হোক প্রাণে বাঁচতে হবে, এই চিন্তাটা অস্থির করে তুলল বাস্‌কেথকে। ভাবল, খুনীরা হয়তো জানে না এই দ্বীপে আরও একজন রক্ষী আছে। জানে না, কিন্তু জানতে কতক্ষণ? জাহাজ তীরে ভিড়তে যা দেরি, ছুটে বাতিঘরে ঢুকবে তারা। কোন সন্দেহ নেই, বাতিঘরের আলোও নিশ্চয় নিভিয়ে দেবে। পূর্ব-শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ফিলিপ আর মরিসকে খুন করেছে ওরা, এ হতেই পারে না। ওরা বাতিঘরের আলোকরক্ষী, সেজন্যেই খুন করেছে। তারমানে লোকগুলোর শত্রুতা আসলে আলোটার সঙ্গেই।

মাথাটা এখন কাজ করছে। আর সময় নষ্ট না করে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে লণ্ঠন-ঘর থেকে নিচে নেমে এল সে।

ওদিকে খুনী লোকগুলো পানিতে নৌকা নামাবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ বাঁচতে হলে এখুনি পালাতে হবে বাস্‌কেথকে। দ্রুত হাত চালাল সে। সামনে যে-ক'টা রিভলভার পেল সব গুঁজে নিল কোমরের বেল্টে। একটা ব্যাগে নিল প্রচুর গুলি আর বারুদ। ওই ব্যাগেই ভরল কিছু খাবার ও প্রয়োজনীয় অন্য দু'একটা জিনিস। বাতিঘর সংলগ্ন ঢালু জমিতে নামল সে। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। এভাবেই শুরু হলো তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এখন

দেখা যাক জলদস্যুদের সে ফাঁকি দিতে পারে কিনা।

ছয়

দ্রুত সন্ধ্যা ঘনাল, কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল স্টাটেন আইল্যান্ড। বাতিঘরের আলোটা জ্বলছে না, ফলে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে জাঁকিয়ে বসল। তার ওপর আজ আবার কুয়াশা পড়ছে। বাতাসের বেগও বেশ জোরালো। সম্ভবত একটা ঝড় উঠবে। আজ রাতটা ভীতিকর ও অভিশপ্ত। নিজের চোখেই তো দেখল বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস বিনা কারণে খুন হয়ে গেল।

সময়টা শীতকাল নয়, অথচ ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। এটা আসলে তার ভয়ের কাঁপুনি। প্রিয় সহকারীদের কথা স্মরণ করে আবার তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। বাতিঘর থেকে স্পষ্টই দেখেছে সে, ওদের লাশগুলো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে পানিতে। শিউরে উঠে সে ভাবল, ওকেও এভাবে খুন করে ফেলে দেয়া হত পানিতে–ভাগ্যের নেহাতই জোর বলতে হবে যে ওই সময় লণ্ঠন-ঘরে জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল সে।

চেষ্টা করেও মনটাকে শান্ত করতে পারছে না বাস্‌কেথ। ফিলিপ আর মরিসকে খুব বেশি দিন থেকে চেনে না সে, কিন্তু অল্প এই কদিনেই ওদেরকে সে ভালবেসে ফেলেছিল। তিনজন

ওরা একসঙ্গে চাকরির জ যাচ্ছে বেদ-শয় রেছিল, বাতিঘরের দায়িত্বও বুঝে নিয়েছিল ছে না, তাই নাক বাস্‌কেথ একা হয়ে গেছে। শুধু যে একা হয়ে ের দিকেয়, একদল খুনী তাকে খুঁজে বেড়াবে এই দ্বীপে।

বাস্‌কেথ ভাবছে স্কুনারটা স্টাটেন আইল্যান্ডে নোঙর ফেলল কেন? ওটা আসলে কাদের? লোকগুলো কি উদ্দেশ্যে এল এখানে? এই দ্বীপে প্রথম পা ফেলেছে, হাবভাব দেখে তা মনে হয়নি। দ্বীপে পা দিয়েই বাতিঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল কেন? বাতিঘরের প্রতি এই বৈরি মনোভাবের কারণ কি? লোকগুলো কি চাইছে তাদেরকে অনুসরণ করে অন্য কোন জাহাজ যেন স্টাটেন আইল্যান্ডে আসতে না পারে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর বাসুকেথের জানা নেই। জানতে হলে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। দেখামাত্র তারা খুন করবে ওকে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিজেকে তিরস্কার করল বাস্‌কেথ। ভয় পেয়ে যাওয়ায় মাথাটা ঠিকমত কাজ করেনি, মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে। বাতিঘর থেকে পালিয়ে আসার সময় কোন কাগজ-পত্রই সে সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি। ওগুলো নাড়াচাড়া করলে অনায়াসে দ্বীপে তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলবে জলদস্যুরা। আর একবার জানতে পারলে...

এরপর আর ভাবতে পারছে না বাস্‌কেথ।

তীর থেকে দুশো গজ দূরে রয়েছে সে, প্রকাণ্ড একটা পাথরের আড়ালে। এখান থেকে তিন জায়গায় জলদস্যুদের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে—স্কুনারের ডেকে, বালিয়াড়ির ওপর, আর বাতিঘরের জানালায়। মাঝে মধ্যে তাদের কর্কশ গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে সে।

রাত দশটার মধ্যে এক এক করে সব আলো নিভে গেল। স্টাটেন আইল্যান্ডের [illegible] নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাস্‌কেথ চিন্তা করে দেখল, এই [illegible]র আর থাকা উচিত নয়। লুকোবার জন্যে ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে তাকে। এই পাথরের আড়ালে থাকলে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখে ফেলবে ওকে। কিন্তু এখান থেকে সরবেই বা কোথায়? দ্বীপের আরও ভেতর দিকে? নাকি উপসাগরের প্রবেশমুখে?

এই দ্বীপ থেকে পালানো সম্ভব নয়। লুকিয়েই বা ক'দিন থাকবে সে? সান্তা ফে ফিরে আসতে এখনও বহু দেরি, ততদিন কি লুকিয়ে থাকা সম্ভব? তাড়াহুড়ো করে অল্পই রসদ নিয়ে এসেছে, খুব বেশি হলে তিনদিন চলা যাবে। তারপর খাবে কি? লুকিয়ে থাকা যদি সম্ভবও হয়, খাদ্য যোগাবে কে? মাছ ধরতে হলে খোলা জায়গায় বেরুতে হবে তাকে, আর খোলা জায়গায় বেরুলেই খুনীদের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। তাছাড়া, আগুন পাবে কোথায় যে মাছ রেঁধে খাবে?

নিজেকে পরামর্শ দিল বাস্‌কেথ, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। আগে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভ নেই, যখন যে সমস্যা আসবে তখন সেটার সমাধান খুঁজতে হবে। আপাতত সান হুয়ান অন্তরীপের সৈকতে রাত কাটাতে কোন অসুবিধে নেই। রাতের বেলা নিশ্চয়ই তারা ওকে খুঁজতে বেরুবে না। ভোরের আলো ফোটার আগে অন্য কোথাও সরে গেলেই হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারায় মনটা খানিক হালকা হয়ে এল। আবার স্কুনারের দিকে তাকাল সে। জাহাজের ডেকে লোকজনের হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদিকে কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না। একটু আগে গলার আওয়াজ পাওয়া

যাচ্ছিল, এখন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। শয়তান লোকগুলো কোন রকম বিপদের আশঙ্কা করছে না, তাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

টিলার পাশ ঘেঁষে উত্তর দিকে যাচ্ছে বাস্‌কেথ। অভিশপ্ত রাতটা কেমন যেন ভৌতিক লাগছে, বাতাস আর পানির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

রাত এগোরোটার দিকে অন্তরীপের শেষ প্রান্তে পৌঁছাল বাস্‌কেথ। সমতল একটা জায়গা বেছে বের করল, রাতটা কাটিয়ে দিল বালির ওপর শুয়ে।

ঘুম ভাঙল অনেক ভোরে, তখনও সূর্য ওঠেনি। চোখ রগড়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল বাস্‌কেথ। যত দূর দৃষ্টি যায় কোথাও কেউ নেই। সাগর তীরে নৌকাও দেখা যাচ্ছে না। স্কুনারের নিজস্ব নৌকা আর রক্ষীদের ডিঙি, সবই এখন জলদস্যুদের দখলে। সাগরের যত দূর দেখা গেল, একদম ফাঁকা।

বাস্‌কেথের মনে পড়ল, বাতিঘর তৈরি হবার আগে এদিকের পানিতে জাহাজ চালানো কী সাংঘাতিক কঠিন কাজ ছিল। এখন যদি এদিকে কোন জাহাজ আসে, তারা বাতিঘরের কোন সাহায্যই পাবে না। অসহায় বোধ করল সে, সেই সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কোন জাহাজ যদি এদিকে আসে, জলদস্যুরা আলো জ্বেলে পথ দেখাবে না। আলোটা শুধু নিজেদের প্রয়োজনে জ্বালবে তারা। দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিল সে, 'শয়তানের বাচ্চারা!'

বাস্‌কেথের মাথার ভেতর এবার অন্য রকম একটা বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। জলদস্যুরা এই যে আলোটা নিভিয়ে রেখেছে, এর পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। একটা পাথরের ওপর ধপ করে বসে পড়ল সে, সমস্ত ঘটনা এক এক করে স্মরণ করে উপলব্ধি করল জলদস্যুরা আরও অনেক বড় ধরনের অঘটন

ঘটাতে চায়। এদিকে যদি কোন জাহাজ আসে, সেগুলোকে দুর্ঘটনায় পড়তে বাধ্য করবে তারা। আলো নিভিয়ে রাখার সেটাই কারণ। দুর্ঘটনা ঘটলে আগন্তুক জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আরোহী আর নাবিকদের খুন করে জাহাজের সমস্ত মাল-পত্র লুঠ করবে তারা। প্রশ্ন হলো, ওদের ঠেকাবার উপায় কি? একা সে কি করতে পারে?

সান্তা ফে ফিরতে এখনও অনেক দেরি, দু'মাস। এই দু'মাস জলদস্যুদের হাতে সে যদি ধরা না-ও পড়ে, বেঁচে থাকবে কিভাবে?

প্রথম কাজ নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে বের করা। জলদস্যুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে ফেলেছে যে বাতিঘরে তিনজন রক্ষী ছিল। আজ সকাল থেকে তারা নিখোঁজ তৃতীয়জনকে পাগলের মত খুঁজতে শুরু করবে।

হতাশায় মুষড়ে পড়লে চলবে না, নিজেকে পরামর্শ দিল বাস্‌কেথ। বসে না থেকে কাজ শুরু করল সে। একটানা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর সরু একটা গুহা দেখতে পেল। ভেতর দিকে দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। গুহার মেঝেতে বালি আছে। ভাল করে দেখে বুঝতে পারল, ভেতরে জোয়ারের পানি ঢুকবে না, ঝড়ের ঝাপটাও লাগবে না। গুহায় ঢুকে বসল সে, বাতিঘর থেকে বয়ে আনা ব্যাগটা নামিয়ে রাখল পাশে। কাছেই বরফ গলা পানি থেকে তৈরি হয়েছে একটা ঝিল, কাজেই পানীয় জলের কোন অভাব হবে না।

খানিকটা শুকনো মাংসের ফালি আর কয়েকটা বিস্কিট খেলো বাস্‌কেথ। শরীর খানিকটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে গেছে, পানি খাওয়া দরকার। গুহা থেকে বেরুতে যাবে, কি একটা

আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হায় ঈশ্বর, তারমানে জলদস্যুরা এরইমধ্যে ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে! গুহার আড়াল থেকে না বেরিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল সে। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সর্বনাশ! চারজন লোক! একটা নৌকা করে এদিকেই আসছে!

দু'জন লোক বসে আছে, বাকি দু'জন নৌকা চালাচ্ছে। নৌকাটা বাস্‌কেথ চিনতে পারল না। তারমানে ওটা বাতিঘরের নৌকা নয়, স্কুনারের নৌকা। লোকগুলো যে এই দ্বীপে নতুন নয়, সেটা তাদের হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা লোক হাল ধরে আছে, বাস্‌কেথের মনে হলো সে-ই দলের লীডার--হয়তো স্কুনারের ক্যাপটেনও সে। ওর কাছ থেকে এখনও প্রায় একশো গজ নিচে তারা। চোখে পলক পড়ছে না, লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও। লীডারের ইঙ্গিতে তীরে ভেড়ানো হলো নৌকা। সৈকতে নামল তারা। অস্পষ্টভাবে তাদের গলা পাচ্ছে বাস্‌কেথ।

'ঠিক জানো তো এই জায়গাই কিনা?'

'হ্যাঁ, ঠিক জানি। এখান থেকে বিশ গজ দূরে, পাহাড়টার বাঁকে।'

'এ আমাদের নেহাতই সৌভাগ্য যে বাতিঘরের রক্ষীরা গুহাটা আবিষ্কার করতে পারেনি।'

'রক্ষীদের আগে এখানে দেড় বছর ধরে ছিল বাতিঘরের নির্মাতারা, তারাও ওটার খোঁজ পায়নি।'

'নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল তারা, এদিক-ওদিক তাকাবার ফুরসত পায়নি।'

'খুঁজলেও পেত না, কারণ গুহার মুখ তো আমরা পাথর ফেলে ঢেকে রেখেছি।'

'চলো, যাওয়া যাক,' বলল লীডার।

সঙ্গীদের দু'জনকে নিয়ে আড়াআড়িভাবে সৈকত ধরে এগোল লীডার। আড়াল থেকে তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বাস্‌কেথ। এখনও তারা কথা বলছে, কিছু কিছু শুনতেও পাচ্ছে ও। তবে খানিক পরই তাদের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। নৌকার কাছে একজন লোককে রেখে গেছে তারা, সৈকতে পায়চারি করছে সে।

বোঝা গেল কাছাকাছি কোথাও ওদের একটা গোপন গুহা আছে। লোকগুলো জলদস্যু, এটা আগেই সন্দেহ করেছিল বাস্‌কেথ। সন্দেহটা এখন সত্যি প্রমাণিত হলো। এ-ও পরিষ্কার হয়ে গেল, বাতিঘর তৈরি শুরু হবার আগে থেকেই স্টাটেন আইল্যান্ডে আছে তারা। এই দ্বীপ আসলে জলদস্যুদের আস্তানা। একটা গুহায় তারা তাদের লুঠ করা ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে। সেই ধন-সম্পদ এখন সম্ভবত তারা স্কুনারে তুলে নিয়ে যাবে।

বাস্‌কেথের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। গুহায় কি শুধু ধন-সম্পদই লুকিয়ে রাখা হয়েছে? সঙ্গে কিছু রসদ-পত্র নেই? থাকারই তো কথা। সেক্ষেত্রে ওগুলো ওর হাত করা উচিত। বেঁচে থাকার জন্যে কাজে আসবে। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর। চেষ্টা করলে বেঁচে থাকার একটা উপায় তাহলে হতে পারে। লোকগুলো নৌকা নিয়ে চলে যাক, তাদের গুহায় ঢুকে কিছু খাবারদাবার বের করে নেবে ও। রসদ হয়তো প্রচুর পরিমাণেই আছে, যখন খুশি প্রয়োজন মত বের করা যাবে। এভাবে যদি সান্তা ফে ফিরে না আসা পর্যন্ত চালিয়ে দেয়া যায়, মন্দ কি! মনে মনে প্রার্থনা করল বাস্‌কেথ, সান্তা ফে না ফেরা পর্যন্ত খুনীরা যেন দ্বীপেই থাকে। তখন দেখা যাবে কতটুকু ক্ষমতা তাদের। দু'জন নিরীহ লোককে

বিনা কারণে খুন করেছে, এর শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে।

এখন জানার চেষ্টা করতে হবে লোকগুলো কত দিন দ্বীপে থাকার প্ল্যান করেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। গুহা থেকে বেরিয়ে আবার সৈকতের ওপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে ফিরে যাচ্ছে লোকগুলো। আড়াল থেকে তাদের কথা কান পেতে শুনছে বাস্‌কেথ।

'রক্ষী লোকগুলো কিন্তু খারাপ ছিল না, কি বলো? দ্বীপের কোথায় কি আছে তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। সেজন্যেই আমাদের জিনিস-পত্র সব ঠিক আছে।'

'স্কুনার একেবারে ভরাট হয়ে যাবে। আমাদের মাল-পত্র তো কম নয়।'

'বুদ্ধি করে প্রচুর রসদ জমিয়ে রাখায় এখন কাজে লাগবে।'

'হ্যাঁ। তবে সাবধানে খরচ করতে হবে। প্যাসিফিক আইল্যান্ডে পৌঁছাবার আগে যেন সব শেষ হয়ে না যায়।'

কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে লোকগুলো। বাস্‌কেথের শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। ইচ্ছে হলো গুলি করে লোকগুলোর হাসি থামিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল ও। জলদস্যুরা খুন করতে পারে, কারণ খুন করাই তাদের পেশা। কিন্তু সে, বাস্‌কেথ, খুনী নয়। কাজেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গুলি করে কাউকে মারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত যতক্ষণ না সে আক্রান্ত হচ্ছে।

'আহা-হা, দুনিয়ার শেষ প্রান্তে এই একটাই বাতিঘর, সবেধন নীলমণি, সেটাও কেমন অন্ধ হয়ে গেছে!' কথাটা বলে জলদস্যুদের

একজন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'আমরা এখানে থাকতে থাকতেই দু'একটা জাহাজডুবির ঘটনা ঘটবে বলে আশা করছি। বাতিঘর আলো না ফেলায় জাহাজের ক্যাপটেন পাহাড়গুলোকে দেখতে পাবে না, ফলে নির্ঘাত ধাক্কা খাবে। সেই সঙ্গে শুরু হবে আমাদের লুঠপাট। কোন খাটনি ছাড়াই পেয়ে যাব গাদা গাদা সোনা-রূপা।'

'আসলে আমাদের কপাল না খুলে গেছে! এমন একটা স্কুনার এসে সেইন্ট বার্থোলোমিউ-এর তীরে ঠেকল, যাতে কোন লোকজন নেই। এ যেন না চাইতেই বর পাওয়া। ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে স্বপ্নের মত লাগছে।'

বাস্‌কেথ বুঝতে পারল স্কুনারটা কিভাবে জলদস্যুদের হাতে এসে পড়েছে।

একজন প্রশ্ন করল, 'এখন আমাদের প্ল্যান কি, কনগ্রে?'

বাস্‌কেথ যাকে লীডার বলে আন্দাজ করেছিল, সে-ই জবাব দিল, 'পরবর্তী প্ল্যান যেখানে আছে সেখানেই থাক, অর্থাৎ আমার মাথায়। আপাতত চলো মউল ফিরে যাই।'

'গুহার মাল-পত্র জাহাজে তুলতে হবে না?'

'না, এখুনি নয়। জাহাজে টুকিটাকি মেরামতের কাজ বাকি আছে, ওগুলো আগে শেষ হোক।'

'মেরামতের কাজ শেষ হতে ক'দিন লাগবে?'

'ঠিক জানি না। কয়েক হপ্তাও লাগতে পারে।'

আরেকজন বলল, 'মেরামত করতে হলেও তো যন্ত্রপাতি লাগবে, ওস্তাদ? তুমি বললে ওগুলো আমরা নৌকায় তুলি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তা তুলতে পারো। তবে শুধু যে-সব জিনিস মেরামতের কাজে লাগবে।'

'তাহলে আর সময় নষ্ট করি কেন। জোয়ার আসতে খুব বেশি দেরি নেই আর। এই ফাঁকে কাজটা সেরে ফেলা দরকার।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল কনগ্রে। 'জাহাজ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সব জিনিস-পত্র গুহাতেই থাকুক। এখানে তো আর চোর নেই।'

'চোর নেই ঠিক,' একজন বলল, 'কিন্তু ওস্তাদ, মনে আছে তো, বাতিঘরে লোক ছিল তিনজন। একজনকে আমরা ধরতে পারিনি।'

কনগ্রে বলল, 'তার কথা বাদ দাও, সেরেসান্তে। একা সে কি করতে পারবে আমাদের? আমি জানি, ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে লোকটা। বলো তো কিভাবে পটল তুলবে সে?'

'কিভাবে, ওস্তাদ?'

'খেতে না পেয়ে।'

সেরেসান্তে হেসে উঠল।

কনগ্রে আবার বলল, 'তবে সাবধানের মার নেই, সেরেসান্তে। গুহার আশপাশেই থাকতে হবে আমাদের।'

নৌকার কাছাকাছি চলে এসেছিল জলদস্যুরা, যন্ত্রপাতি আনার জন্যে আবার গুহার দিকে ফিরে গেল। খানিক পর দেখা গেল যন্ত্রপাতিগুলো নৌকায় তুলছে। কাজটা শেষ হতে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকাটা।

এক সময় বাস্‌কেথ বুঝতে পারল আপাতত বিপদ কেটে গেছে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সৈকতে দাঁড়াল ও। ওর হাতে এখন দুটো কাজ। প্রথম কাজটা সহজ, দ্বিতীয় কাজটা অত্যন্ত কঠিন। গুহা থেকে খাবার বের করতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না ওর। কিন্তু মউলকে দ্বীপে আটকা রাখার কি ব্যবস্থা

করা যায়?

বাস্‌কেথ চিন্তা করছে। কি করলে সান্তা ফে ফিরে না আসা পর্যন্ত স্কুনারটাকে দ্বীপে থাকতে বাধ্য করা যায়? অনেক চিন্তা করেও কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। তবে মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এল। সান হুয়ান অন্তরীপের কিনারা ঘেঁষে অন্য কোন জাহাজকে আসতে দেখলে সেটাকে সঙ্কেত দিয়ে থামাবার চেষ্টা করতে পারে ও। থামলে ভাল, না থামলে পানিতে নেমে সাঁতার কাটবে ও, যেভাবে হোক জাহাজটায় চড়বে। তারপর কি ঘটেছে সব খুলে বলবে ক্যাপটেনকে। একমাত্র এভাবেই প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে ও। কিন্তু এই মুহূর্তে সাগরে অন্য কোন জাহাজ নেই। আগে কোন জাহাজ আসুক, তখন তাতে চড়ার চেষ্টা করা যাবে।

প্রথম কাজটা অবশ্য এখুনি সেরে ফেলা যায়। রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জলদস্যুদের গুহাটার দিকে এগোল বাস্‌কেথ।

জাহাজ মেরামতের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। তবে কাজটা বেশ কঠিন, তার ওপর দ্বীপে জাহাজ মেরামত করার কোন কারখানা নেই। ছুতোর মিস্ত্রি হিসেবে ভার্গাস দক্ষ, কিন্তু একা সে কতটুকু করবে। কাজ এগোচ্ছে, তবে গতি খুব মন্থর।

প্রথমে গোটা জাহাজ খালি করা হলো। প্রচুর সময় লাগল তাতে। সময়ের অবশ্য কোন অভাব নেই তাদের। বাতিঘরের সাহায্য আসবে আরও দু'মাস পর। এই তথ্যটা তারা জানতে পেরেছে লগবুক থেকে। তাতে লেখা আছে প্রতি তিন মাস পর পর সান্তা ফে বাতিঘরের জন্যে সাহায্য নিয়ে আসবে। সেই হিসেবে মার্চ মাসে ফিরে আসবে সান্তা ফে। এখন ডিসেম্বর চলছে,

তবে শেষ হতে আর মাত্র ক'টা দিন বাকি। ওই লগবুক থেকেই রক্ষীদের নাম জানতে পেরেছে কনগ্রে–বাস্‌কেথ, ফিলিপ আর মরিস।

একজন যে পালিয়ে গেছে, এটা আগেই জেনেছে কনগ্রে। সেজন্যে অবশ্য তার কোন মাথাব্যথা নেই। একটা লোক একা তাদের কি ক্ষতি করবে! বেঁচে থাকতে হলে খাবার দরকার হবে, সেটাই তো তার নেই।

হঠাৎ জানুয়ারির তিন তারিখে আবহাওয়া খুব বেয়াড়া হয়ে উঠল। দক্ষিণ দিগন্তের কাছে দ্রুত জমে উঠল কালো মেঘ। একটুপরই ঝড় শুরু হয়ে গেল। তাপমাত্রা প্রায় এক লাফে বেড়ে গেল ষোলো ডিগ্রী। গোটা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। বাজ পড়ল বিকট শব্দে। সেই সঙ্গে সাগরও যেন খেপে উঠল।

কনগ্রে ভয় পেল মউল না তীরে আছড়ে পড়ে। তাহলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে স্কুনারটা। তবে ভাগ্য ভাল যে এমন জায়গায় নোঙর ফেলেছে তারা, ঝড়ের মূল ধাক্কাটা সেখানে লাগল না। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে কনগ্রে আরেকটা নোঙর ফেলল, মউল যাতে তীরের সঙ্গে ধাক্কা না খায়। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কনগ্রে উদ্বিগ্ন হয়নি, কারণ সবাই তারা বাতিঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে প্রচুর রসদও জড়ো করা হয়েছে। রক্ষীদের রসদও কম নয়। তারপরও যদি লাগে, গুহা থেকে আনা যাবে।

ঝড়টা শুরু হবার পর আর থামতেই চায় না। আবহাওয়ার এই খেপামি জানুয়ারির বারো তারিখ পর্যন্ত একটানা চলল। উপায় নেই, এই ক'টা দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলো

তাদেরকে।

বারো তারিখ রাতে হঠাৎ বাতাসের গতিপথ বদলে গেল। এবার বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। তারমানে দ্বীপের আরেক দিকে শুরু হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব।

গত দশ দিনে একটাই মাত্র জাহাজ স্টাটেন আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়েছে। রাতে নয়, দিনে। জাহাজটার ক্যাপটেন বুঝতে পারেনি বাতিঘরটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা।

জাহাজটাকে দেখামাত্র সঙ্কেত দিতে শুরু করল বাস্‌কেথ। কিন্তু তিন মাইল দূরে থেকে জাহাজের কেউ তার সঙ্কেত দেখতে পেল না।

সাত

ঝড়ের কবলে পড়ায় স্কুনার মউলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। তেরোই জানুয়ারি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ভার্গাস রিপোর্ট করল, ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক।

কনগ্রে হুকুম করল, 'এখুনি মেরামতের কাজ শুরু করে দাও।'

মাথা নেড়ে ভার্গাস জানাল, 'আমার একার পক্ষে মেরামত করা সম্ভব নয়। মউলকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে হলে সমস্ত ত্রুটি প্রথমে সারাতে হবে। তাতে সময় তো লাগবেই, কাজে হাতও

লাগাতে হবে সবাইকে।'

কনগ্রে নির্দেশ দিল, 'কারও বসে থাকা বা কাজে ফাঁকি দেয়া চলবে না। ভার্গাসের অধীনে সবাই তোমরা কাজ শুরু করো।'

সমস্যা দাঁড়াল মউলকে চড়ায় তুলে আনা নিয়ে। চড়ায় না তোলা হলে মেরামত করা সম্ভব নয়। তা তুলতে হলে ভরা জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই বিনা কাজে আরও দুটো দিন কাটিয়ে দিতে হলো।

এই ফাঁকে কনগ্রে আর সেরেসান্তে তাদের পুরানো গুহায় এল একবার। বাতিঘরের দখল করা নৌকাটা আকারে বড়, তাই সেটা নিয়েই রওনা হলো তারা। এবার যাচ্ছে গুহা থেকে নৌকা বোঝাই করে সোনা-রূপা ও অন্যান্য দামী জিনিস-পত্র নিয়ে এসে জাহাজে তোলার জন্যে। আবহাওয়া ইতিমধ্যে একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, বাতাস নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, আর সাগর যেন ঘুমিয়ে আছে।

রওনা হবার আগে আলোকস্তম্ভের লণ্ঠন-ঘরে উঠল সেরেসান্তে, সাগরের চারদিকটা একবার দেখে নেবে। চোখ বুলিয়ে স্বস্তিবোধ করল সে, যত দূর দৃষ্টি যায় সাগর একেবারে খালি, কোথাও কোন জলযানের চিহ্ন মাত্র নেই। গোটা দ্বীপটাও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে। না, কোথাও কেউ নেই।

সাগরের স্রোতে নৌকা ছাড়ল তারা। তর তর করে ছুটছে নৌকা, কনগ্রে সৈকতের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। একজন রক্ষী পালিয়েছে, এ-কথা সে ভোলেনি। লোকটাকে নিয়ে সে কোন দুশ্চিন্তায় ভুগতে না চাইলেও, গলায় কাঁটা আটকানোর মত একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি বিরক্ত করছে সারাক্ষণ। খোঁজাখুঁজি করবার

ঝামেলায় তারা যাবে না, তবে দেখতে পেলে লোকটাকে অবশ্যই খুন করবে।

দু'দিকের তীরই খালি, কোথাও কিছু নড়ছে না। এদিকে কিছু পাখি সারাক্ষণ কিচিরমিচির করছে শুধু। গুহার কাছে তারা পৌঁছাল বেলা এগারোটার দিকে। নৌকায় আরও দু'জন দস্যু আছে, তাদেরকে সৈকতে রেখে কনগ্রে আর সেরেসান্তে গুহার দিকে হাঁটা ধরল।

আগে যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি আছে গুহার ভেতরটা। কোন জিনিসই খোয়া যায়নি, অন্তত দেখে তাই মনে হলো তাদের। তবে এত বেশি জিনিস-পত্র ঠাসা হয়েছে এখানে, কিছু চুরি গেলেও বোঝার উপায় নেই।

সোনা ও রূপা সহ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস তোলা হলো নৌকায়। এবার ফিরতি যাত্রা শুরু হবে। হঠাৎ কনগ্রে বলল, 'আমার মন কেন জানি না খুঁত খুঁত করছে।'

'সে কি, ওস্তাদ!' সেরেসান্তে বিস্মিত। 'কি ব্যাপার বলো তো?'

জবাব না দিয়ে কনগ্রে জানাল, 'আমি একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসতে চাই।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ,' বলল সেরেসান্তে। 'তুমি একদিকে যাও, আমি আরেক দিকে যাই।'

অন্তরীপের দুই মাথার দিকে রওনা হলো দু'জন। একটা টিলার ওপর উঠল কনগ্রে। এখান থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। চারদিক খাঁ খাঁ করছে, কোথাও কিছু নেই। নড়ার মধ্যে শুধু সাগরের ঢেউই নড়ছে। কোথাও মানুষজনের ছায়ামাত্র নেই।

দু'জন প্রায় একই সময়ে ফিরে এল নৌকার কাছে। না, কারও

চোখেই কিছু ধরা পড়েনি। কোন কারণ নেই, কনগ্রে গম্ভীর হয়ে আছে। ওস্তাদের মেজাজ বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল সেরেসান্তে। নৌকা নিয়ে বাতিঘরের কাছে ফিরে এল তারা। বেলা তখন তিনটে।

চড়াটা ক্রমশ ঢালু, অনেক কায়দা-কৌশল করে সেটার গায়ে ঠেকানো হলো মউলকে। প্রচণ্ড খাটনির কাজ, ফলে জলদস্যুরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভার্গাস অবশ্য কাউকে বিশ্রাম নিতে দিতে রাজি হলো না, সেদিন অর্থাৎ ষোলো তারিখ থেকেই মেরামতের কাজে হাত লাগাতে বাধ্য করল সবাইকে। কাজ করতে গিয়ে একটা বাধা পেল তারা, প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে সময় নষ্ট হচ্ছে। জোয়ার এলে চড়া ডুবে যায়, তখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই।

তবে আবহাওয়া বেশ ভালই থাকল। পনেরো দিন কাজ করল তারা, এর মধ্যে কোন ঝড়-টড় উঠল না। কাজটা কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ভার্গাস, ছোটখাট বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও প্রথম পর্বটা পনেরো দিনের মধ্যেই শেষ হলো। জানুয়ারির পুরো মাসটাই ভাল থাকল আবহাওয়া, ফলে কাজ চালিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। দু'একবার কয়েক পশলা করে বৃষ্টি হলেও কাজ থামাতে হয়নি।

এই দেড় মাসে স্টাটেন আইল্যান্ড থেকে মাত্র দুটো জাহাজকে দেখা গেল। প্রথম জাহাজটা ইংল্যান্ডের। একদিন ভর দুপুরবেলা স্টাটেন আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে দূর দিগন্তে অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে গেল সেটা। বাতিঘর সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানতে পারল না জাহাজটার লোকজন।

দ্বিতীয় জাহাজটা এল রাতের বেলা। এল বলাটা ভুল, বলা উচিত কাছাকাছি আসতে গিয়েও এল না, ঘুরে অন্য দিকে চলে গেল। অন্ধকারে বোঝা যায়নি কোন্ দেশের জাহাজ। তবে আভাস পাওয়া গেল আকারে সেটা প্রকাণ্ডই হবে। টাওয়ারের লণ্ঠন ঘর থেকে সেরেসান্তে ওটার শুধু সবুজ আলোই স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। বেশিরভাগ সম্ভাবনা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সাগর পাড়ি দিচ্ছে ওটা, তাও জানে না স্টাটেন আইল্যান্ডে বাতিঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে কিনা। খুব একটা কাছাকাছি না এলেও, চেষ্টা করলে জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত বাস্‌কেথ। কিন্তু সঙ্কেত পাঠাবার কোন চেষ্টাই করেনি ও। তখনও ভোর হয়নি, দিগন্তের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজটা।

আবহাওয়া আবার বিরূপ হতে শুরু করল জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ থেকে। জলদস্যুদের ভাগ্যটা আসলে ভাল, কারণ ইতিমধ্যে স্কুনার মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে তাদের। ঝড় একটা উঠল বটে, কিন্তু তাতে মউল বা জলদস্যুদের কোন ক্ষতি হলো না। ঝড়টা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ীও হয়নি। ফেব্রুয়ারির দু'তারিখ থেকে আবার শান্ত হয়ে গেল বাতাস।

এরপর শুরু হলো জাহাজে কার্গো ভরার পালা। মেরামতের কাজ পুরোপুরি শেষ হবার আগে থেকেই গুহা থেকে কিছু কিছু জিনিস-পত্র বের করে আনা হয়েছে। সে-সব রাখা হয়েছিল বাতিঘরের স্টোররুমে। এখন সেগুলো জাহাজে তোলা হচ্ছে।

একদিন গুহায় ঢুকে কয়েকটা রঙের কৌটা দেখল কনগ্রে। দেখামাত্র তার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। শিষ্যদের ডেকে হুকুম করল, 'মউলের গায়ে নতুন রঙ চড়াও। নামটাও বদলে ফেলো।'

সেরেসান্তে সকৌতুকে জানতে চাইল, 'মউলের নতুন নাম কি হবে, ওস্তাদ?'

ওস্তাদ কনগ্রে হেসে উঠে জবাব দিল, 'স্কুনারের নতুন নাম রাখলাম সেরেসান্তে।'

আনন্দে জলদস্যুরা হাততালি দিল। কৃতজ্ঞ সেরেসান্তে হ্যান্ডশেক করল কনগ্রের সঙ্গে। 'এ তোমার মহত্ত্ব, ওস্তাদ। তুমি সত্যি খুব বড় হৃদয়ের মানুষ।'

চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভরা জোয়ারের সময় চড়া থেকে নামিয়ে খাঁড়ির সেই আগের জায়গাতেই নিয়ে যাওয়া হলো নতুন রঙ করা 'সেরেসান্তে'-কে। এবার পুরোদমে কার্গো ভরার কাজ শুরু হলো। জলদস্যুরা সবাই খুব খুশি। এতদিন পর তাদের স্বপ্ন সার্থক হতে যাচ্ছে। উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে পারবে এমন একটা জাহাজের মালিক এখন তারা। প্রবল উৎসাহে কাজ করছে সবাই। আর মাত্র ক'দিন পরই যাত্রা শুরু করবে তারা। ইগোর উপসাগরকে পিছনে রেখে, লেময়র প্রণালী পার হয়ে, খোলা সাগর ধরে ফুলস্পীডে ছুটবে 'সেরেসান্তে' প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। সবচেয়ে বেশি খুশি কনগ্রে। বিপুল ধন-সম্পদ লুঠ করেছে সে, প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে উঠে বাকি জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার।

বাতিঘরের তৃতীয় রক্ষী অর্থাৎ বাস্‌কেথের কথা একরকম ভুলেই গেছে তারা।

আট

স্কুনার মউল স্টাটেন আইল্যান্ডে নোঙর ফেলার পর থেকে সান হুয়ান অন্তরীপের তীরে আত্মগোপন করে আছে বাস্‌কেথ। ইচ্ছে করলেই দ্বীপের আরও গভীরে, অত্যন্ত দুর্গম কোথাও চলে যেতে পারত ও। যায়নি দুটো কারণে। এক, এখানে থাকলে জলদস্যুদের ওপর নজর রাখা যাবে। দুই, মনে ক্ষীণ একটা আশা, কোন জাহাজকে কাছাকাছি আসতে দেখলে সঙ্কেত দিয়ে সেটাকে থামাতে পারবে, তারপর জাহাজে চড়ে খুলে বলতে পারবে এখানে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে, সবশেষে খুনীদের শায়েস্তা করার জন্যে ক্যাপটেনের সাহায্যও চাইতে পারবে।

তবে কোন জাহাজ এদিক দিয়ে যাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনিতে এদিকে কোন জাহাজ আসে না, বিশেষ করে আবহাওয়া ভাল থাকলে। শুধু ঝড় উঠলে নিরাপদ আশ্রয় পাবার আশায় কোন জাহাজ এলেও আসতে পারে। তবু বাস্‌কেথের মনে একটা আশা, কোন না কোন জাহাজ এদিকে আসবেই।

নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে সেজন্যেই দ্বীপের এদিকটায় রয়েছে ও। জলদস্যুরা তার সহকারীদের খুন করেছে,

প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে।

বেঁচে থাকার জন্যে রসদ দরকার, তার ব্যবস্থা আগেই হয়েছে। জলদস্যুদের গুহা থেকে যখন যেমন প্রয়োজন বের করে আনছে ও। আড়াল থেকে জলদস্যুদের কাজকর্ম রোজই দেখছে, জানে স্কুনার মেরামতের কাজটা শেষ হতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে রোজই প্রার্থনা করে, সান্তা ফে ফিরে না আসা পর্যন্ত স্কুনারটা যেন থাকে।

কিন্তু সান্তা ফে ফিরে আসতে এখনও দু'মাস বাকি। বাস্‌কেথের বিশ্বাস হয় না ততদিন স্টাটেন আইল্যান্ডে থাকবে জলদস্যুরা। তাদেরকে চলে যেতে দেখলেও ওর কিছু করার নেই। অতগুলো খুনীর বিরুদ্ধে একা তার কি-ই বা করার আছে।

বাস্‌কেথ সিদ্ধান্ত নিল, লুকিয়ে থাকার উপযোগী আরেকটা গুহা খুঁজে বের করবে। এখন যে গুহাটায় রয়েছে সেটা জলদস্যুদের গুহার খুব কাছাকাছি।

কয়েক দিন খোঁজাখুঁজি করার পর পাঁচশো গজ দূরে, প্রণালীর কাছাকাছিই, মনের মত একটা গুহা পেয়ে গেল বাস্‌কেথ। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে এখানে একটা গুহা আছে, মুখটা বিশাল একজোড়া পাথরের আড়ালে লুকানো। বাইরে ঘোরাফেরা করে নানা দিক থেকে দেখল বাস্‌কেথ—নাহ্, গুহার মুখ সত্যি দেখা যায় না। বলে না দিলে কেউ এটাকে দেখতে পাবে না। ও দেখতে পেয়েছে নিতান্তই ভাগ্যক্রমে। নিজের জিনিস-পত্র নিয়ে ঠিকানা বদল করল বাস্‌কেথ।

জলদস্যুরা এদিকে খুব কমই আসে। বাস্‌কেথ ঠিকানা বদল করার পর এদিকে মাত্র একবার এল কনগ্রে আর সেরেসান্তে।

তারপর এখন পর্যন্ত আর কেউ আসেনি।

শুধু সন্ধের দিকে খুব সাবধানে গুহা থেকে বেরোয় বাস্‌কেথ। উদ্দেশ্য জলদস্যুরা কি করছে দেখা। একটা গুহার ভেতর একা সময় কাটানো কি যে কষ্টকর, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও। প্রতি মিনিটকে মনে হয় একটা দিন। তার ওপর নিজের অক্ষমতা কুরে কুরে খায় ওকে। রোমহর্ষক সেই দৃশ্যটা সে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই নির্মমভাবে ফিলিপ আর মরিসকে হত্যা করা হলো। প্রতিশোধ নিতে না পারার জ্বালায় রাতে সে ভালভাবে ঘুমাতেও পারে না। মাঝে মধ্যে হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ইচ্ছে হয় গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়, খুনীদের সর্দারের সঙ্গে হিসাবটা চুকিয়ে ফেলে। কিন্তু সেটা যে আত্মঘাতী কাজ হবে, একটু পরই তা বুঝতে পেরে অক্ষম আক্রোশে হাঁপাতে থাকে।

বাস্‌কেথ জানে, অপরাধ করে কেউ কখনও পার পায় না, একদিন না একদিন সাজা তাকে পেতেই হবে। একা তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, তাই সেদিনের অপেক্ষাতেই থাকতে হবে ওকে।

তবে সংশয়ও জাগে মনে। সত্যি কি খুনীরা শাস্তি পাবে? দিন তো বসে নেই, এক এক করে পার হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে স্কুনার মেরামতের কাজও শেষ করে আনছে জলদস্যুরা। হিসাব কষে বাস্‌কেথ দেখল, সান্তা ফে ফিরে আসতে এখনও তিন হপ্তা বাকি। এই হিসাব জলদস্যুরাও জানে, লগবুক দেখে অনেক আগেই তারা জেনে গেছে কবে ফিরবে সান্তা ফে। ক্যাপটেন লাফায়েত ফিরে আসার আগেই স্টাটেন আইল্যান্ড ছেড়ে চলে যাবে তারা। একবার চলে গেলে কে তাদেরকে ধরে, আর কে-ই বা শাস্তি দেয়!

দেখতে দেখতে ষোলোই ফেব্রুয়ারি এসে গেল। স্কুনার মেরামতের কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে, গুহা থেকে বের করে সব মাল-পত্রও তোলা হয়েছে জাহাজে, জলদস্যুরা এবার দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে উঠল বাস্‌কেথ। কিছু একটা করতে হবে ওকে। কিন্তু কি করবে? গুহার ভেতর ছটফট করতে লাগল বেচারা। এক সময় অস্থিরতা এত বেড়ে গেল যে গুহায় টিকতে পারল না, ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। তখন সূর্য পাটে বসেছে, হাঁটতে হাঁটতে উপসাগরের প্রবেশমুখে চলে এল বাস্‌কেথ। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, নিজেও বলতে পারবে না কখন উত্তরের তীর ধরে আবার হাঁটতে শুরু করেছে বাতিঘরের দিকে।

ঝপ করে চারদিকে অন্ধকার নেমে এল। জলদস্যুদের ওকে দেখতে না পাবারই কথা। তবু প্রকাশ্যে এভাবে বেরিয়ে আসাটা বোকামি হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্‌কেথ সেটা খেয়াল করছে না। জলদস্যুরা সবাই এখনও জাহাজে চড়েনি, হঠাৎ তাদের কারও সামনে পড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু তবু ধরা পড়ার ভয়টা ওকে ক্ষান্ত করতে পারছে না। হন হন করে হাঁটছে ও, হাঁটছে কান দুটো খাড়া করেই। মনে মনে একটা হিসাব করল, উপসাগরের মাঝামাঝি পৌঁছাতে হলে আরও তিন মাইল হাঁটতে হবে ওকে।

রাত ন'টা বাজল। প্রায় পৌঁছে গেছে বাস্‌কেথ, আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে বাতিঘর। হঠাৎ ওর সংবিৎ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বাতিঘরের জানালা গলে বাইরে আলো আসছে। খাঁড়ির যেখানে স্কুনারটা থাকার কথা সেখানে কিছুই নেই। স্কুনারে আলো জ্বলছে না, তাই সেটাকে দেখতে পাচ্ছে না

বাস্‌কেথ। সাবধানে, কোন শব্দ না করে, আরও একশো গজ এগোল ও। বাতিঘরের দরজা বন্ধ, জলদস্যুরা সম্ভবত খাওয়াদাওয়া সারছে, কিংবা এক জায়গায় বসে আড্ডা মারছে। এত রাতে বাইরে তাদের না বেরুনোরই কথা। ধীর পায়ে আবার হাঁটতে শুরু করল বাস্‌কেথ। খানিক দূর এসে আবার দাঁড়াল। স্কুনারটা এখন দেখতে পাচ্ছে ও। খাঁড়ির পাড় ঘেঁষে পানিতে ভাসছে ওটা। বাস্‌কেথ ভাবল, জাহাজটায় আগুন ধরানো যায় না?

জাহাজে কোন লোকজন আছে বলে মনে হলো না। এ থেকে ধরে নেয়া চলে মেরামতের কোন কাজ আর বাকি নেই। আরও খানিক কাছে এসে বুঝতে পারল, সব মাল-পত্র এখনও তোলা হয়নি স্কুনারে। আচ্ছা, জাহাজটা তাহলে আরও কয়েকটা দিন থাকবে দ্বীপে।

এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়। জাহাজে আগুন জ্বালতে হলে প্রস্তুতি দরকার, সে প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আসেনি বাস্‌কেথ। আজ ওর ফিরে যাওয়াই উচিত।

পরদিন ভোর হবার আগেই জলদস্যুদের গুহায় এল বাস্‌কেথ। কিছু খাবারদাবারও দরকার, দেখাও হবে গুহায় মাল-পত্র কি পরিমাণে আছে। ওর ধারণাই ঠিক, সব মাল-পত্র জাহাজে তুলতে আরও তিন দিন লাগার কথা। যে-কোন মুহূর্তে এগুলো নেয়ার জন্যে চলে আসতে পারে তারা, কাজেই কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া দরকার। কিন্তু হাজারটা জিনিস-পত্রের মধ্যে খাদ্যবস্তু কোথায় রাখা হয়েছে কে জানে, অনেক খুঁজেও পাচ্ছে না ও। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সব খাবারদাবার জাহাজে তোলার জন্যে সরিয়ে ফেলেছে জলদস্যুরা।

চিন্তায় পড়ে গেল বাস্‌কেথ। ওর নিজের গুহায় সামান্য কিছু খাবার আছে, তাতে হয়তো কোনমতে দু'তিনদিন চালিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তারপর খাবে কি?

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ল। বাইরে থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল বাস্‌কেথ। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। তীরে একটা নৌকা ভিড়েছে, তা থেকে নিচে নামছে তিনজন লোক। সর্বনাশ! এখন কি হবে! বাস্‌কেথের মাথাটা কাজ করছে না। বুঝতে পারছে পালানো দরকার, কিন্তু পালানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। এখন যদি গুহা থেকে বেরোয়, ওকে তারা দেখে ফেলতে পারে।

গুহা থেকে না বেরিয়ে আরও ভেতর দিকে সরে এল বাস্‌কেথ। সবচেয়ে অন্ধকার দেখে একটা কোণে, জিনিসপত্রের আড়ালে, কুঁকড়ে বসে থাকল। লুকিয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ভাবছে জলদস্যুদের হাতে কোন অবস্থাতেই ধরা পড়বে না ও। তারা যদি ওকে দেখে ফেলে, খুন হবার আগে তাদেরও দু'একজনকে খুন করবে। কোমরের বেল্টে হাত বোলাল বাস্‌কেথ। হ্যাঁ, লোড করা রিভলভারটা জায়গামতই আছে। বাস্‌কেথ নিজেকে মনে করিয়ে দিল, ও একা, ওরা তিনজন। কাজেই যা করার বুঝে-শুনে করতে হবে। বোকার মত কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না।

একজনকে নৌকার কাছে রেখে গুহায় ঢুকল সেরেসান্তে আর ভার্গাস। সামনে রয়েছে সেরেসান্তে, তার হাতে একটা লণ্ঠন। ভেতরে ঢুকেই কাজ শুরু করল তারা—এদিক সেদিক থেকে

নানারকম জিনিস-পত্র এনে একজায়গায় জড়ো করছে। কাজের ফাঁকে কথা বলছে ওরা।

ভার্গাসই প্রথম কথা বলল, 'আজ যেন কত তারিখ, সেরেসান্তে?'

'কাল ষোলো তারিখ ছিল, আজ তাহলে ফেব্রুয়ারির সতেরো।'

'আমরা অনেক দেরি করে ফেলছি, না?' জিজ্ঞেস করল ভার্গাস।

'চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিয়ে বলল সেরেসান্তে। 'খুব শিগ্‌গির এখান থেকে কেটে পড়ব।'

'শিগ্‌গির মানে কবে?'

'কালই,' বলল সেরেসান্তে। 'অবশ্য সব মাল যদি জাহাজে তোলা সম্ভব হয় আর কি।'

ভার্গাস মন্তব্য করল, 'সম্ভব না হবার কোন কারণ নেই। আবহাওয়া তো ভালই দেখা যাচ্ছে।'

'এখন পর্যন্ত ভাল,' বলল সেরেসান্তে। 'কিন্তু সকালের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলে?'

'না। কেন?'

'আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখেছি। তবে আশা করি ওগুলো সরে যাবে, থাকবে না।'

ভার্গাসকে চিন্তিত দেখাল। 'ঝড়-টড় উঠলে আমাদের কিন্তু রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে। আচ্ছা, কোন কারণে আমরা যদি এক-দেড় হপ্তা রওনা হতে না পারি?'

'তাহলে বিপদ একটা হতেও পারে।'

'সান্তা ফে ফিরে আসতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে বললাম তো, চিন্তা কোরো না—কালই আমরা রওনা হব।'

রুদ্ধশ্বাসে তাদের কথাবার্তা শুনছে বাস্‌কেথ। সেরেসান্তে আর ভার্গাস লণ্ঠন নিয়ে গুহার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি একটা খুব দরকারী জিনিস অনেক খুঁজেও পাচ্ছে না তারা। জরুরী সব জিনিসই ইতিমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, শুধু এই একটাই বোধহয় বাকি। ওরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে, দু'একবার বাস্‌কেথের গায়ে পা ফেলতে গিয়েও ফেলল না। হাতে রিভলভার নিয়ে তৈরি হয়েই আছে বাস্‌কেথ, ওর উপস্থিতি প্রকাশ হওয়ামাত্র গুলি করবে। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা না দিলে খুনোখুনির মধ্যে যাবে না।

আধ ঘণ্টা পর গুহার মুখ থেকে চিৎকার করে নিজেদের লোকটাকে ডাকল সেরেসান্তে। লোকটা এসে মাল-পত্র বয়ে নিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করল তাদেরকে। গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ভেতরটায় একবার চোখ বোলাল সেরেসান্তে। সেটা লক্ষ করে ভার্গাস বলল, 'এত মাল-পত্র ফেলে রেখে যেতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'ফেলে তো যেতেই হবে,' বলল সেরেসান্তে। 'স্কুনারে মাল ঠাসার একটা সীমা আছে তো। ওটা যদি আরও কয়েক টন মাল বেশি টানতে পারত, তাহলে কি আর ফেলে যেতাম। এখন বাধ্য হয়েই শুধু বাছাই করা জিনিসগুলো নিতে হচ্ছে।'

গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। বাস্‌কেথেরও যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

*

নিজের গুহায় ফিরে এল বাস্‌কেথ। চিন্তায় পড়ে গেছে ও। জলদস্যুরা তাদের গুহা থেকে সব খাবারদাবার সরিয়ে নিয়ে গেছে। কালই তারা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। সন্দেহ নেই, বাতিঘরে যে খাবার ছিল তা-ও এতদিনে সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে তারা। এখন তাহলে কি খেয়ে বাঁচবে ও?

বাঁচার একমাত্র উপায় স্কুনারটাকে দ্বীপে আটকে রাখা। প্রতিশোধ নিতে হলেও ওটাকে চলে যেতে দেয়া যায় না। কিন্তু একার চেষ্টায় কিভাবে জাহাজটাকে আটকাবে ও?

সকাল থেকেই মেঘ করল আকাশে। সাগরও উত্তাল হয়ে উঠছে। প্রবল বাতাসে ঝড়ের আভাস। বাস্‌কেথ প্রার্থনা করল, তুমুল একটা ঝড় আসুক, তাহলে জলদস্যুরা কাল দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

সারাদিনই খারাপ থাকল আবহাওয়া। সন্ধের দিকে পরিষ্কার হয়ে গেল, আসছে, সত্যি একটা বিরাট ঝড় আসছে। আকাশে মেঘের অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। বাতাসও যেন খেপে উঠছে। বাস্‌কেথের অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই বুঝতে পারছে খুব বড় একটা ঝড়ই আসছে।

নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে গুহা থেকে বেরিয়ে এল বাস্‌কেথ। সৈকতে দাঁড়িয়ে অন্ধকার হয়ে আসা দিগন্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখের কোণে কি যেন একটা নড়তে দেখল ও। পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে চেঁচিয়ে উঠল বাস্‌কেথ, 'ওহ্, জাহাজ!' বাতাসে ভর করে ওর সেই চিৎকার অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে গেল। 'জাহাজ আসছে! একটা জাহাজ

আসছে!'

বাস্‌কেথ ভুল দেখেনি। পুব দিক থেকে সত্যি একটা জাহাজ আসছে বটে। কিন্তু এই সময় হঠাৎই শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়। খেপে উঠে রীতিমত প্রলয়নৃত্য শুরু করে দিল প্রকৃতি। বাস্‌কেথের ধারণাই ঠিক, এ সাধারণ কোন ঝড় নয়, এ হলো যাকে বলে হারিকেন!

হারিকেন শুরু হতে যাচ্ছে অথচ খুনী লোকগুলো তারপরও বাতিঘরের আলো নিভিয়ে রেখেছে। বিপদে পড়েছে জাহাজটা, এদিকে আসার সেটাই কারণ। জাহাজের ক্যাপটেন নিশ্চয়ই আশা করছেন নতুন তৈরি বাতিঘরটা তাকে পথ দেখাবে, আশপাশে বিপদ থাকলে সাবধান করে দেবে। চোখে বিনকিউলার তুলে নিশ্চয়ই বাতিঘরটা খুঁজছেন তিনি। কিন্তু আলো না জ্বালা হলে অন্ধকারে তো বেচারা কিছুই দেখতে পাবেন না।

ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ক্যাপটেন। কয়েক মাইলের মধ্যে এখানে একটা দ্বীপ আছে, ঝড় আর অন্ধকারের মধ্যে জাহাজের লোকজন তা জানতেই পারবে না। জাহাজের ওরা সবাই এখন অন্ধ। নিয়ন্ত্রণহীন জাহাজ একটু পরই ছুটে এসে ধাক্কা খাবে পাথুরে তীরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে ওটা। আরোহী আর নাবিকরা উত্তাল সাগরে পড়ে ডুবে মরবে।

কি সর্বনাশ ঘটতে চলেছে বুঝতে পারা সত্ত্বেও বাস্‌কেথের কিছু করার নেই। জলদস্যুদের অভিশাপ দিচ্ছে ও। টাওয়ারের লণ্ঠনঘর থেকে জাহাজটাকে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছে তারা, অথচ তারপরও বাতিটা জ্বালছে না। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে!

তাদের মনে কি দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই? খুব বেশি হলে আর আধ ঘণ্টা, আলো না জ্বালা হলে এর মধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়বে জাহাজটা। জানা কথা, এ-ধরনের দুর্ঘটনায় কেউ বাঁচে না।

লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এ ঝড় সহজে থামবে না।

সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিপজ্জনক, তবু গুহায় ফেরার কথা ভাবছে না বাস্‌কেথ। একটা বড় পাথরকে আলিঙ্গন করে তাকিয়ে আছে খেপে ওঠা সাগরের দিকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও। অনেকক্ষণ পর পর, জাহাজটা যখন ঢেউয়ের মাথায় চড়ে, দু'এক মুহূর্তের জন্যে ওটার ক্ষীণ আলো চোখে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে যে ঝড় আর সাগর জাহাজটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। প্রকৃতির এ যেন এক হিংস্র উল্লাস। বাগে পাবার পর জাহাজটাকে কোনমতে আজ রেহাই দেবে না।

পাথরটা ছেড়ে সৈকতে ছুটোছুটি করছে বাস্‌কেথ। উত্তেজনায় শক্ত মুঠো হয়ে আছে হাত দুটো। এখনও ওর আশা, বাতিঘরের আলোটা জ্বলে উঠবে। মাঝে মধ্যে প্রলাপও বকছে। কখনও বা অভিশাপ দিচ্ছে জলদস্যুদের। হাত তুলে শাসাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু সবই বৃথা। বাতিঘরের আলো জ্বলছে না।

ওদিকে জাহাজটা অনিবার্য ধ্বংসের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে।

হঠাৎ বাস্‌কেথের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জাহাজের ক্যাপটেন যদি বুঝতে পারে যে এদিকে ডাঙা আছে, তাহলে অবশ্যই দিক বদলে অন্য দিকে সরে যাবার চেষ্টা করবে। চারদিকে অনেক ভাঙা ডালপালা আর কাঠের টুকরো পড়ে রয়েছে,

ওগুলো এক জায়গায় জড়ো করে কোন রকমে যদি আগুন ধরানো যায়, জাহাজ থেকে কি ওরা দেখতে পাবে না? খুব বেশি দূরে থাকলে এই ঝড়ের মধ্যে আগুনটা চোখে না-ও পড়তে পারে, কিন্তু দূরত্ব যদি আধ মাইলের মত হয় তাহলে তো না দেখতে পাবার কোন কারণ নেই। তীর থেকে আধ মাইল অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব নয়, তবু শেষ মুহূর্তে দুর্ঘটনা এড়াবার চেষ্টা অন্তত করতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাস্‌কেথ। বেশ কিছু কাঠ আর শুকনো ডালপালা নিয়ে অন্তরীপের মুখের কাছে চলে এল। এখানেও কিছু ডালপালা দেখা যাচ্ছে। ঝড়ের মাতামাতি প্রচণ্ড হলেও, এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। আগুন একবার জ্বালতে পারলে সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বাস্‌কেথ বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আগুন জ্বালার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর বাস্‌কেথ বুঝতে পারল, নাহ্, কোন লাভ নেই, অনেক দেরি করে ফেলেছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যেই সাগরের দিকে তাকাচ্ছিল ও, হঠাৎ অতিকায় একটা দৈত্যের মত কি যেন চোখে পড়ল। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে পাক খাচ্ছে জিনিসটা। ওটাই যে সেই জাহাজ, বাস্‌কেথের আর বুঝতে বাকি থাকল না। বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় জমে পাথর হয়ে গেল ও। পরমুহূর্তে বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ করে বিশাল এক জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ছুটে এসে পাথুরে তীরে ধাক্কা খেলো সেই অজ্ঞাত পরিচয় জাহাজটা।

বাস্‌কেথের কানে তালে লেগে গেছে। জাহাজটা মনে হলো যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হয়েছে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল লোকজনের আর্তনাদ। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপর আর কোন শব্দ

নেই। এখন শুধু সেই আগের মত সাগর গজরাচ্ছে আর মেঘ ডাকছে মাথার ওপর। জাহাজটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। সন্দেহ নেই, ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে গেছে সেটা।

নয়

পরদিন ভোরবেলা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্‌কেথ দেখল, ঝড়ের দাপট এতটুকু কমেনি। সাগরের দিকে তাকানো যায় না, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। প্রকৃতি এমন গর্জন করছে, কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা। একটা কথা ভেবে মনে মনে খুশি হলো ও, এরকম ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যে স্কুনারটা রওনা হতে পারবে না।

তারপরই আঁতকে উঠল বাস্‌কেথ। অন্তরীপের দুশো গজ দূরে কাল রাতের সেই জাহাজটা পড়ে আছে। দেখে ওটাকে আর জাহাজ বলে চেনবার উপায় নেই, ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কাঠামো দেখে বোঝা যায়, জাহাজটা কম করেও পাঁচশো টন কার্গো বহন করতে পারত। বিধ্বস্ত জাহাজটার আশপাশে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না বাস্‌কেথ। নাবিক আর আরোহীদের খোঁজে চারদিকে চোখ বোলাল, কিন্তু একজনও নেই।

জলদস্যুরা? তারা কি টের পায়নি যে তীরে একটা জাহাজ

ভেঙে পড়ে আছে? টের না পাবার কথা নয়। এতক্ষণে হয়তো জাহাজটা লুঠ করার জন্যে বাতিঘর থেকে রওনা হয়ে গেছে তারা। কিংবা হয়তো এরইমধ্যে জাহাজের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

বাস্‌কেথ নড়ছে না। আগে ওকে জানতে হবে জলদস্যুরা কি করছে। কিন্তু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও তাদের কাউকে জাহাজে বা জাহাজের আশপাশে দেখা গেল না। এবার ছুটল বাস্‌কেথ। হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এল ভাঙা জাহাজটার কাছে।

জাহাজটার নাম 'সেনচুরি মবিল', কোন রকমে পড়া গেল। অর্থাৎ এটা মার্কিন জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা রাজ্যের রাজধানীর নাম মবিল। কাজেই ধরে নিতে হয় এটা মবিল-এর জাহাজ ছিল। ছিলই বলতে হবে, কারণ সেনচুরি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। বৃথাই খোঁজাখুঁজি করল ও—না দেখল কোন লোককে, না পেল কোন লাশ। সবাই কি তাহলে সাগরে ডুবে মারা গেছে, তারপর ভেসে গেছে স্রোতের টানে? নিশ্চয়ই তাই। জাহাজের কিছুই অক্ষত বা অটুট নেই, ঝড় যেটাকে ভাঙতে পারেনি সেটাকে তুবড়ে দিয়েছে।

কাত হয়ে আছে সেনচুরি, তাই সেটায় উঠতে বাস্‌কেথের কোন অসুবিধে হলো না। ধ্বংসযজ্ঞ কাকে বলে, এবার তা চাক্ষুষ করার সুযোগ হলো ওর। জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড তোড় ভেতরের সব জিনিস ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মালপত্র কি আছে তা দেখার জন্যে অবশ্য জাহাজে ঢোকেনি বাস্‌কেথ, ঢুকেছে আহত কোন লোক পাওয়া যায় কিনা দেখতে। কিন্তু লোক তো নয়ই, এমন কি একটা লাশও চোখে পড়ল না। সম্ভবত জাহাজ তীর থেকে দূরে থাকতেই জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে তারা।

জাহাজ থেকে তীরে নেমে এসে আবার চারদিকে চোখ বোলাল বাস্‌কেথ। মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। জলদস্যুরা এদিকে আসেনি কেন? জাহাজটা ধ্বংস হবার জন্যে তারাই তো দায়ী। বাতিঘরের বাতিটা জ্বাললে জাহাজের ক্যাপটেন সাবধান হবার সুযোগ পেতেন, সেক্ষেত্রে এদিকে জাহাজটা আসতই না, আর না এলে এই দুর্ঘটনাও ঘটত না। দুর্ঘটনা ঘটবে জেনেও বাতিটা তারা জ্বালেনি, তারমানে নিশ্চয়ই তাদের কুমতলব ছিল–জাহাজটা লুঠ করবে।

লুঠই যদি করবে, এখনও তারা আসেনি কেন?

চিন্তিত বাস্‌কেথ অন্তরীপের শেষ মাথার দিকে হাঁটছে। ওদিকটায় জাহাজের কোন লোকজন থাকতেও পারে। হয়তো দুর্ঘটনার পর আশ্রয়ের খোঁজে ওদিকে চলে গেছে দু'একজন। 'আহত কাউকে যদি পাই,' বাস্‌কেথ ভাবছে, 'তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব আমি।'

কিন্তু কোন লাভ হলো না। দ্বীপের কোথাও কেউ নেই। আবার হাঁটতে হাঁটতে জাহাজের কাছে ফিরে এল বাস্‌কেথ। এবার ওর দৃষ্টি জাহাজের ভাঙা টুকরোগুলোর ওপর। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খাবারদাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছে। ভাগ্যটা ওর ভালই বলতে হবে, একটা বাক্স আর একটা কৌটা পাওয়া গেল–বাক্সে রয়েছে সুস্বাদু বিস্কিট আর কৌটায় শুকনো মাংস। পরিমাণেও কম নয়, বাস্‌কেথ একা বেশ কিছুদিন খেতে পারবে। এই খাবারগুলো রাজা সলোমনের রত্নভাণ্ডারের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। তাই তাড়াতাড়ি নিজের গুহায় রেখে এল বাস্‌কেথ। তারপর অন্তরীপের এক ধারে চলে এসে উপসাগরের দিকে চোখ রাখল।

বাস্‌কেথ ধরে নিয়েছে কাল রাতের জাহাজডুবির কথা অবশ্যই জলদস্যুরা জানে। তীরের দিকে যখন ছুটে আসছিল জাহাজটা, তাদের দেখতে না পাবার কথা নয়। ঝড়ের কারণে নিজেরা যেহেতু রওনা হতে পারেনি, ভাঙা জাহাজটার মাল-পত্র লুঠ করার জন্যে অবশ্যই এদিকে তারা একবার আসতে বাধ্য।

একটা টিলায় উঠছে বাস্‌কেথ। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে উঠতে হচ্ছে ওকে। কিন্তু টিলার মাথায় আর ওঠা হলো না, তার আগেই একটা চিৎকার শুনে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এদিক ওদিক তাকাল ও। আবার শোনা গেল চিৎকারটা। কে যেন গোঙাচ্ছে। বাস্‌কেথ বাতিঘর থেকে পালিয়ে প্রথমে যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, আওয়াজটা সেদিক থেকে আসছে।

পঞ্চাশ গজের মত এগোতেই লোকটাকে দেখতে পেল বাস্‌কেথ। বিশাল এক পাথরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। লোকটা গোঙাচ্ছে, আর হাত তুলে বাতাসকেই যেন আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি তার পাশে চলে এল ও।

লোকটা আহত। দেখে মনে হলো ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মত বয়েস হবে। পরনে নাবিকের ইউনিফর্ম। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। শরীরে বা কাপড়ে রক্তের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আহত হলেও, জখম বোধহয় খুব একটা মারাত্মক নয়। বাস্‌কেথ ধারণা করল, সেনচুরির এই একটা লোকই সম্ভবত বেঁচে গেছে। ও যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি। ঝুঁকে তার কাঁধ স্পর্শ করল ও।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখ-মুখ ব্যথায় কুঁচকে আছে। আবার চিৎকার করে উঠল সে, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

লোকটাকে ধরে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসাল বাস্‌কেথ। অভয় দিয়ে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে সব রকম সাহায্য করব।'

লোকটা আবার বাতাসকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে গেল। বাস্‌কেথ বুঝতে পারল, লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে। নিশ্চিত হবার জন্যে তার বুকে কান ঠেকিয়ে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনল ও। না, শুধু জ্ঞানই হারিয়েছে, মারা যায়নি!

বেঁচে যখন আছে, প্রথম কাজ লোকটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। এই লোকের সেবা-শুশ্রূষা দরকার। তাছাড়া, যে-কোন মুহূর্তে জলদস্যুরা এসে পড়তে পারে। খুন করাই যাদের পেশা ও নেশা; এই লোককে দেখামাত্র তারা মেরে ফেলবে।

লোকটাকে কাঁধে তুলে নিজের গুহায় নিয়ে এল বাস্‌কেথ। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিল, কিন্তু তবু জ্ঞান ফিরছে না। এই মুহূর্তে ওর আর কিছু করার নেই। শরীরটা পরীক্ষা করে আঘাতের কোন চিহ্ন পায়নি ও। তবে হাড় দু'একটা ভেঙে থাকতে পারে। সত্যি ভেঙেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। না, ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পেল লোকটা। চোখ মেলেই বিড়বিড় করল সে, 'পানি! একটু পানি!'

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে তাকে পানি খাওয়াল বাস্‌কেথ। 'এখন কেমন লাগছে, ভাই? একটু ভাল?'

ভাঙা, বেসুরো গলায় লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, সামান্য।' এদিক ওদিক তাকাল সে, কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করল। 'তুমি কে? আমি কোথায়? এখানে আমি কিভাবে এলাম?'

'আমি তোমাকে উদ্ধার করে এনেছি। এখানে তোমার কোন ভয় নেই,' বলল বাস্‌কেথ। 'তোমাদের জাহাজ সেনচুরি ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি তীরে পড়ে থাকতে দেখে এখানে তুলে এনেছি।'

'সেনচুরি!' লোকটা কয়েক মুহূর্ত বাস্‌কেথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে!'

বাস্‌কেথ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি, ভাই?'

'আমার নাম ডেভিস—জন ডেভিস।'

'তুমি কি সেনচুরির ক্যাপটেন?'

'না, ফার্স্ট মেট। সেনচুরির আর সবাই কোথায়?'

মাথা নাড়ল বাস্‌কেথ, ম্লান স্বরে বলল, 'আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি। সম্ভবত তুমি একাই বেঁচে আছ।'

'ওহ্, গড! ওরা…ওরা সবাই মারা গেছে?'

'ঠিক জানি না। হয়তো তাই…'

শোকে ও হতাশায় ডেভিস একেবারে ভেঙে পড়ল। 'কি করে বাঁচলাম আমি! বাঁচলামই যদি, একা কেন বাঁচলাম!' খানিক পর বাস্‌কেথের দিকে তাকাল সে। 'তুমিই তাহলে আমাকে উদ্ধার করেছ। ধন্যবাদ, ভাই। তোমার ঋণ কোনদিন আমি শোধ করতে পারব না।' ডেভিস হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে।

'তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। বলো কি খাবে।'

'না, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি, ভাই আমাকে বরং আরেকটু পানি দাও।'

পানিই দিল বাস্‌কেথ, তবে খানিকটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে–পেটে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠবে। হলোও তাই। ধাক্কাটা সামলে উঠে ধীরে ধীরে নিজের গল্পটা বলে গেল ডেভিস।

সেনচুরি সাড়ে পাঁচশো টনী জাহাজ। ক্যাপটেনের নাম হেনরি। তিন হপ্তা আগে মবিল বন্দর থেকে রওনা হয় ওরা। গন্তব্য ছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। হেনরি আর ডেভিস ছাড়াও জাহাজে নাবিক ছিল বারোজন। যাত্রার শুরুর দিকটা ভালই ছিল। কিন্তু স্টাটেন আইল্যান্ডের কাছাকাছি এসে ভীষণ ঝড়ের কবলে পড়ল ওরা, ক্যাপটেন জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। স্টাটেন আইল্যান্ডে বাতিঘর তৈরি হয়েছে, এ-কথা ক্যাপটেন জানতেন। তিনি আশা করছিলেন বাতিঘরের আলো অন্তত দশ মাইল দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে। তাই আলো দেখতে না পেয়ে ক্যাপটেন ধরে নেন, স্টাটেন আইল্যান্ডের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে জাহাজ। এই সময় বিনা নোটিশে বিকট বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করে পাথুরে তীরে আছড়ে পড়ে সেনচুরি। ওই এক ধাক্কাতেই সব শেষ হয়ে যায়।

কিভাবে কি ঘটল বর্ণনা করার পর বাস্‌কেথকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাল ডেভিস। তবে এখনও বেচারা বুঝতে পারছে না কোথায় সে রয়েছে। বাস্‌কেথকে জিজ্ঞেস করল, 'এই জায়গাটা কোথায়, ভাই?'

'স্টাটেন আইল্যান্ড।'

'স্টাটেন আইল্যান্ড!'

'হ্যাঁ। ইগোর উপসাগরের মুখে...'

'কোথায় জানি বৈকি। কিন্তু তাহলে...বাতিঘর?'

'বাতিঘরের আলো জ্বালা হয়নি।'

'আলো জ্বালা হয়নি?' হাঁ করে বাস্‌কেথের দিকে তাকিয়ে থাকল ডেভিস।

সব কথা তাকে খুলে বলল বাস্‌কেথ। জলদস্যুরা কিভাবে ফিলিপ আর মরিসকে খুন করল, কিভাবে সে প্রাণ হাতে করে বাতিঘর থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, কিছুই বাদ দিল না। ফিলিপ আর মরিসের কথা বলবার সময় তার গলাটা ধরে এল।

'কী সাংঘাতিক! কী ভয়ঙ্কর!' আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ডেভিসের মুখ। 'বাতিঘরের আলো না জ্বালার জন্যে ওই জলদস্যুরাই তাহলে দায়ী! তারমানে ওদের জন্যেই সেনচুরির এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে!'

'হ্যাঁ।' বাস্‌কেথ তারপর জলদস্যুদের পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কেও একটা ধারণা দিল ডেভিসকে। 'মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে স্কুনারে। কথা ছিল আজ ভোরেই তারা রওনা হবে।'

'ধারণা আছে, কোথায় যেতে চায় ওরা?' জানতে চাইল ডেভিস।

'আড়াল থেকে শুনেছি, প্যাসিফিক আইল্যান্ডের দিকে যাবে।'

'কিন্তু ঝড় না থামা পর্যন্ত রওনা হতে পারছে না।'

'না, তা পারছে না। এই দুর্যোগ এক হপ্তার আগে কাটবে বলেও মনে হয় না।'

'ওরা যতক্ষণ বাতিঘর দখল করে রাখবে ততক্ষণ বাতিটা জ্বালবে না, কি বলো?'

'না, জ্বালবে না।'

'এর মানে হলো, সেনচুরির মত আরও জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়তে পারে?'

'পারে।'

'সেক্ষেত্রে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না,' বলল ডেভিস। 'এদিকে কোন জাহাজকে আসতে দেখলে সংকেত দিয়ে সাবধান করে দিতে হবে।'

'সেনচুরিকে আমি সাবধান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে আগুন জ্বালতে পারিনি।'

'দু'জন মিলে চেষ্টা করলে ঠিকই পারব,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ডেভিস। 'জলদস্যুরা যে-কদিন দ্বীপে থাকবে আলোটা জ্বলবে না। সাগরের যে অবস্থা দেখছি, এদিকে কোন জাহাজ এলে নির্ঘাত দুর্ঘটনায় পড়বে।'

'আবহাওয়া একটু ভাল হলেই শয়তানগুলো দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে...'

'কি করে বুঝলে?'

'জলদস্যুরা জানে পালা বদলের জন্যে খুব শিগ্‌গির সান্তা ফে স্টাটেন আইল্যান্ডে ফিরে আসবে।'

'সান্তা ফে মানে?'

'আর্জেন্টিনার জাহাজ। মার্চের প্রথম দিকে আমাদের বদলী রক্ষীদের নিয়ে এখানে পৌঁছাবে। ফেব্রুয়ারির আজ আঠারো, আর বেশি দেরি নেই।'

'এসো তাহলে প্রার্থনা করি আবহাওয়া যেন এই ক'টা দিন খারাপই থাকে,' বলল ডেভিস। 'সান্তা ফের সাহায্য পেলে শয়তানগুলোকে ঠিকই আমরা শায়েস্তা করতে পারব।'

ডেভিস যেন বাস্‌কেথের মনের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল।

দশ

ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস কনগ্রেকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। আবহাওয়ার ভাবসাব দেখে তার সন্দেহ হতে লাগল চলতি মাসের শেষ পর্যন্ত দুর্যোগ কাটবে না। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাক আর ভাল হোক, মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টাটেন আইল্যান্ড ত্যাগ করতে হবে তাদেরকে। রক্ষীদের পালা বদলের দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, সান্তা ফের ফিরে আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই।

ঝড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা জাহাজ ছুটে এসে দ্বীপের পাথুরে তীরে আছড়ে পড়েছে। কনগ্রের মনে হলো, এ নিশ্চয়ই প্রকৃতির সদয় দান। দামী কিছু জিনিস-পত্র জাহাজটাতে না থেকেই পারে না। কাজেই একবার গিয়ে দেখে আসা দরকার।

আগের দিন, সূর্য যখন ধীরে ধীরে ডুবছে, লণ্ঠন-ঘর থেকে জাহাজটাকে দেখতে পায় সেরেসান্তে। ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটা হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেরেসান্তে সঙ্গে সঙ্গে কনগ্রেকে ডেকে

দেখাল। অন্ধকারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত জাহাজটার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি তারা। তখনই বোঝা যাচ্ছিল, সান হুয়ান অন্তরীপ আর পয়েন্ট সেভারেল-এর মাঝখানে কোথাও ডুববে ওটা। সে-সময় তারা যদি বাতিঘরের আলোটা জ্বালত, অবশ্যই রক্ষা পেত জাহাজটা। কিন্তু একটা জাহাজকে কেন তারা বাঁচাতে যাবে? তাতে কি লাভ তাদের? তারচেয়ে তীরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেলেই বরং লুঠপাট করতে পারবে।

একটা নৌকায় চড়ে রওনা হলো কনগ্রে, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য। জাহাজের কাছে পৌঁছে হৈ-চৈ শুরু করল তারা, ফলে বাস্‌কেথ আর ডেভিসের আলোচনায় বাধা পড়ল।

গুহার মুখ থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল বাস্‌কেথ। ওর পিছন থেকে ডেভিসও উঁকি দিচ্ছে। জলদস্যুরা গুহা থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে। কনগ্রেকে চিনতে পারল বাস্‌কেথ। তাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে ডেভিসকে বলল, 'ওই লোকটা, জাহাজের ভাঙা মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে ওই হলো জলদস্যুদের লীডার, কনগ্রে।'

'যার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে চেনো না?'

'কনগ্রের ডান হাত সে, সেরেসান্তে। লণ্ঠন-ঘর থেকে পরিষ্কার দেখেছি আমি, ফিলিপ আর মরিসকে যারা খুন করেছে তাদের মধ্যে সেরেসান্তেও ছিল।'

'একবার যদি কুত্তাগুলোকে বাগে পাই রে···, দাঁতে দাঁত চাপল ডেভিস।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সেনচুরির মাল-পত্র খুঁজল জলদস্যুরা। বেশিরভাগই পানিতে ভেসে গেছে, তবু প্রয়োজনীয় অল্প কিছু

জিনিস এক জায়গায় জড়ো করল তারা। কনগ্রে ওগুলো নৌকায় তোলার নির্দেশ দিল।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জাহাজটাকে পরীক্ষা করল তারা। তারপর দেখা গেল সেরেসান্তেও হাজির হয়েছে, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য, তাদের সবার হাতে কুঠার আর শাবল। তারা এসেই ভাঙা জাহাজটাকে আরও ভালভাবে ভাঙতে শুরু করল।

'কি ব্যাপার? কি ঘটছে বলো তো? ভাঙা জাহাজকে আরও ভাঙার কি কারণ?'

ডেভিসের ঠোঁটে তিক্ত হাসি ফুটল। 'কি ব্যাপার বুঝতে পারছ না? ওরা চাইছে না সেনচুরির অস্তিত্ব থাকুক। জাহাজটা এখানে পড়ে থাকলে একদিন না একদিন তদন্ত হবে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তাও ফাঁস হবে। জাহাজ না থাকলে প্রমাণও হারিয়ে যাবে। এবার বুঝলে?'

তারপর দেখা গেল সেনচুরির ক্যাপটেনের কেবিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে এল সেরেসান্তে। সেটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করল সে, তারপর বাতাসে উড়িয়ে দিল। দৃশ্যটা দেখে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ল ডেভিস। 'বদমাশ!' হিসহিস করে উঠল সে। 'কত বড় সাহস, আমার জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলল!' তারপরই গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পিছু নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল বাস্‌কেথ। জোর করে টেনে আনল গুহার ভেতর। 'এমন বোকামি করে কেউ? দেখে ফেললে মেরে ফেলবে যে!'

ধীরে ধীরে শান্ত হলো ডেভিস। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

'ধৈর্য ধরতে হবে, ডেভিস,' নরম সুরে বলল বাস্‌কেথ। 'আবহাওয়ার যে অবস্থা দেখছি, ঝড় থামলেও সাগর শান্ত হতে আরও ক'দিন লাগবে। তারমানে আরও দিনকয়েক দ্বীপে থাকতে হবে তাদেরকে।'

'কিন্তু সান্তা ফে আসতে তো এখনও অনেক দেরি।'

'এমনও তো হতে পারে যে নির্দিষ্ট দিনের আগেই পৌঁছে গেল সান্তা ফে?'

'প্রার্থনা করি তাই যেন পৌঁছায়।'

'এদিক দিয়ে অনেক জাহাজই তো গেছে,' বলল বাস্‌কেথ। 'তারা বাতিঘরের আলো জ্বলতে দেখেনি। এই খবরটা আর্জেন্টিনায় পৌঁছেও থাকতে পারে। বাতি কেন জ্বলেনি, এটা জানার জন্যে ক্যাপটেন লাফায়েত সময়ের আগে রওনা হলে আমি একটুও অবাক হব না।'

বেলা চারটের দিকে নৌকা ভর্তি মাল-পত্র নিয়ে ফিরে গেল জলদস্যুরা। সন্ধের দিকে ঝড়ের প্রকোপ আরও বাড়ল। সেই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি।

বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তাপমাত্রা আরও কমে গেল। বাস্‌কেথ আর ডেভিস গুহা থেকে বেরুতেই পারল না। এক কোণে আগুন জ্বেলে আঁচ পোহাচ্ছে ওরা।

রাতে সাগর আরও খেপে উঠল। সৈকত ধরে অনেক দূরে চলে আসছে পানির তোড়। জলোচ্ছ্বাসের এতটা বাড়াবাড়ি আগে কখনও দেখা যায়নি। ডেভিস বলল, 'খুব খুশি হই ওদের জাহাজটা যদি ভেঙে যায়।'

রাত যত বাড়ছে সাগর ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। বিশাল সব

ঢেউ এসে সেনচুরির ভাঙা টুকরোগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আগেভাগে কিছু খাবার পেয়ে যাওয়ায় ওদের কোন চিন্তা নেই, এক দেড় মাস চলে যাবে দু'জনের। অবশ্য তার আগেই পৌঁছে যাবে সান্তা ফে।

একুশ আর বাইশে ফেব্রুয়ারি একই রকম থাকল আবহাওয়া। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে না, সাগরও শান্ত হবার নাম করছে না। তেইশ তারিখে বৃষ্টিটা কমল, তারপর থেমে গেল। গুহা থেকে এবার বেরিয়ে এল ওরা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করবে। খানিকটা হাঁটার পরই একটা কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ডেভিস। নিজেই উঠল সে, দেখল একটা ধাতব বাক্সের সঙ্গে পা বেধে গিয়েছিল। বাক্সটার গায় 'সেনচুরি' শব্দটা খোদাই করা রয়েছে। খুলে দেখে ভেতরটা গোলা-বারুদে ঠাসা।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল ডেভিস। 'আহা, এগুলো দিয়ে যদি ওদের জাহাজটা উড়িয়ে দেয়া যেত!'

'গুহায় ফেরার সময় বাক্সটা তুলে নিয়ে যাব আমরা।'

আবার ওরা তীর ধরে এগোচ্ছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে, এই সময় হঠাৎ বাস্‌কেথ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা কি?'

দূরে একটা কালো কি যেন দেখা যাচ্ছে। দু'জনেই ছুটল সেদিকে। জিনিসটা দেখে বিস্ময়ে বোবা বনে গেল ওরা। একটা কামান! এটার গায়েও সেনচুরির নাম খোদাই করা।

বাস্‌কেথই প্রথম ভাষা ফিরে পেল। 'ডেভিস, এ যে দেখছি তোমার সম্পত্তি!'

'এই কামানের সাহায্যে আমরা সঙ্কেত দিতাম। কিন্তু এটা আর আমাদের কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।'

'গোলা-বারুদ আর কামান যখন পেয়েছি, আশা করি ওগুলো কাজে লাগাবারও সুযোগ হবে,' গম্ভীর সুরে বলল বাস্‌কেথ।

'কি সুযোগ পাবার আশা করো তুমি, শুনি?'

'রাতে কোন জাহাজকে আসতে দেখলে কামান দেগে সাবধান করতে পারব,' বলল বাস্‌কেথ।

ডেভিস যেন মনে মনে অন্য কিছু ভাবছে। জিজ্ঞেস করল, 'এটাই তোমার ইচ্ছা?'

'হ্যাঁ। তবে এই কাজে বিপদ আছে। কামানের আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খুঁজতে বেরুবে জলদস্যুরা। ভাল করে খুঁজলে পেয়েও যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা খুন হয়ে যাব। তা হই হব, তবু আর কোন জাহাজকে আমরা দুর্ঘটনায় পড়তে দিতে চাই না।'

'তুমি একটা দায়িত্ব পালন করতে চাইছ। খুব ভাল কথা। কিন্তু দায়িত্ব পালন করার আরও ভাল একটা উপায় আছে।' সেই উপায়টা কি তা অবশ্য ডেভিস ব্যাখ্যা করল না।

কামানটা ধরাধরি করে গুহায় নিয়ে আসতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ওরা। ফিরে এসে গোলা-বারুদের ভারী বাক্সটাও বইতে হলো। ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসল ওরা।

খেতে মাত্র বসেছে, আবহাওয়ার কি অবস্থা দেখবার জন্যে টিলার ওপর হাজির হলো সেরেসান্তে আর ভার্গাস। আকাশ আর সাগর পরীক্ষা করে তারা বুঝতে পারল জাহাজের নোঙর তোলা

এখনও নিরাপদ নয়। আধ ঘণ্টা পর টিলা থেকে নেমে বাতিঘরে ফিরে গেল তারা।

'ইচ্ছে হচ্ছিল গুলি করে ফেলে দিই ওদেরকে, গুহার মুখ থেকে ফিরে এসে আবার খেতে বসে বলল বাস্‌কেথ। 'সুযোগটা অবশ্য আবার পাব। এখন থেকে মাঝেমধ্যেই আবহাওয়ার অবস্থা বোঝার জন্যে টিলার ওপর উঠবে ওরা।'

ডেভিসকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। তার ধারণা, সাগর পুরোপুরি শান্ত না হলেও স্কুনার নিয়ে রওনা হয়ে যাবে জলদস্যুরা। রাতে শোবার আয়োজন চলছে, বাস্‌কেথকে সে বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে, বাস্‌কেথ। শুনবে?'

'কি প্রস্তাব?'

'আমি তোমার প্রতি চিরঋণী, কারণ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার অনুমোদন নেই এমন কোন কাজ আমি করতে চাই না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। শোনার পর ভাল করে ভেবে দেখে তারপর নিজের মতামত দাও। তুমি মত না দিলে আমি সত্যি খুব দুঃখ পাব।'

'ভূমিকা বাদ দাও তো। যা বলবার সরাসরি বলো।'

'দুর্যোগ তো কেটে যাবেই। ঝড়ও থামবে, সাগরও শান্ত হবে। আমার ধারণা, খুব তাড়াতাড়ি রওনা হবে ওরা। দু'একদিনের মধ্যেই।'

'তো?'

'এই দ্বীপ ছেড়ে একবার ওরা চলে গেলে পরে আর ধরা সম্ভব নয়। ওরা তোমার বন্ধুদের খুন করেছে, আমার বন্ধুদেরও খুন করেছে। তুমি-আমি দু'জনেই প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু ওরা

চলে গেলে কার ওপর প্রতিশোধ নেব?'

'তুমি এখনও শুধু ভূমিকাই করছ,' একটু বিরক্তিই প্রকাশ পেল বাস্‌কেথের গলায়।

'আমার প্রস্তাব হলো, এসো, স্কুনারটাকে অচল করে দিই আমরা।'

'কিভাবে তা সম্ভব?' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল বাস্‌কেথ।

'একটু কষ্ট করলেই কামানটাকে আমরা টিলার ওপর তুলতে পারি।'

'তা হয়তো চেষ্টা করলে পারি। কিন্তু তারপর?'

'তারপর কামানে গোলা ভরব। এক সময় যখন স্কুনারটা টিলার সামনে দিয়ে যাবে, ওটাকে টার্গেট করে গোলা ছুঁড়ব।'

'মাই গড!'

'তাতে হয়তো স্কুনারটা পুরোপুরি অচল হয়ে পড়বে না, তবে এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ওটার আর সাগর পাড়ি দেয়ার অবস্থাও থাকবে না। অর্থাৎ মেরামতের জন্যে আরও কিছুদিন দ্বীপে থাকতে হবে ওদের। মেরামত শুরু করার আগে আরও ঝামেলা আছে। সব মাল-পত্র আবার নামাতে হবে তীরে। সব মিলিয়ে অন্তত দু'হপ্তার জন্যে আটকা পড়বে ওরা। ততদিনে আশা করা যায় ফিরে আসবে সান্তা ফে।'

ছুটে এসে ডেভিসের একটা হাত চেপে ধরল বাস্‌কেথ। 'আমিও তো তাই চাই, ভাই! তুমি আমার মনের কথাই বলেছ। ডেভিস, এই কাজ আমাদের করতেই হবে...'

বাইরে তখন হুঙ্কার ছাড়ছে সাগর।

এগারো

ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখে পরিষ্কার বোঝা গেল, আবহাওয়া শান্ত হয়ে আসছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কনগ্রে সিদ্ধান্ত নিল, আজই তারা স্টাটেন আইল্যান্ড ত্যাগ করবে। সেরেসান্তেকে ডেকে নির্দেশ দিল সে, 'এমনভাবে প্রস্তুতি নাও, বিকেলেই যাতে আমরা নোঙর তুলতে পারি।'

সেরেসান্তে বলল, 'জোয়ার শুরু হবে সন্ধে ছ'টার দিকে। তাহলে তখনই আমরা রওনা হব।'

জলদস্যুরা জোরেশোরে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

সম্ভব হলে সকালেই রওনা হত কনগ্রে, কিন্তু ঘন কুয়াশা থাকায় চিন্তাটা বাতিল করে দিয়েছে সে। ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি মাল তোলায় জাহাজটা যতটুকু পানির নিচে ডুবে থাকার কথা তারচেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি ডুবে আছে।

দুপুরের দিকে বাতিঘরের সামনে পায়চারি করছিল কনগ্রে। সেরেসান্তেকে বলল, 'কুয়াশা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। একটু পরই সাগর পরিষ্কার হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এরকম অবস্থায় জোয়ার একটু আগে চলে আসে।'

'হ্যাঁ, আমিও তা জানি, ওস্তাদ,' বলল সেরেসান্তে। 'তবে

রাতটাও সম্ভবত খুব কালো হবে। আমার হিসেবে চাঁদ উঠবে সেই ভোরের দিকে।'

'চাঁদ-তারা থোড়াই আমি কেয়ার করি,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কনগ্রে। 'এই এলাকা আমার খুব ভাল করে চেনা আছে।'

'কাল এই সময় এখান থেকে আমরা অনেক দূরে থাকব, ওস্তাদ।'

'হ্যাঁ, সেইন্ট বার্থোলোমিউকে পিছনে ফেলে বহুদূরে চলে যাব। আশা করি কাল সন্ধের আগেই বিশ মাইলের মত এগোতে পারা যাবে।'

'এখানে কিন্তু আমরা অনেক বেশি দেরি করে ফেললাম, ওস্তাদ।'

'সেজন্যে তোমার মন খারাপ?'

'না, মন খারাপের কি আছে। এখানে থাকায় আমাদের বরং প্রচুর লাভ হয়েছে। তবে মন একটু খুঁত খুঁত করছে, ওস্তাদ। তিন নম্বর রক্ষীটা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, তার আর কোন খোঁজই পেলাম না। গত দু'মাস কি খেলো লোকটা? কোথায় লুকিয়ে থাকল? যদি মারা গিয়ে না থাকে...'

কনগ্রে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আমরা যে সান্তা ফে ফিরে আসার আগেই রওনা হতে পারছি, এটা আমাদের নেহাতই সৌভাগ্য।'

'কাগজ ঘেঁটে যতটুকু বুঝেছি, আর সাতদিনের মধ্যে জাহাজটা এসে পড়বে।'

'ততদিনে ওদের নাগালের বাইরে চলে যাব আমরা।'

'তা যাব। ভাল কথা, ওস্তাদ, লণ্ঠন-ঘর থেকে শেষবারের মত

সাগরটাকে একবার দেখে নিতে চাই। যদি কোন জাহাজ...'

'যাও, দেখো। তবে কোন জাহাজ আসুক বা না আসুক, আমাদের প্ল্যান যেমন আছে তেমনি থাকবে। আমাদের জাহাজের নাম এখন সেরেসান্তে। সেরেসান্তের কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর সবার জন্যে খোলা, যে-কেউ ব্যবহার করতে পারে। কাজেই কাউকে ভয় পাবার কোন দরকার নেই। যদি কোন জাহাজ আসেই, সেটাকে আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব।'

টাওয়ারে উঠে লণ্ঠন-ঘরে ঢুকল সেরেসান্তে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে চারপাশের সাগরে চোখ বোলাল সে। এক ঘণ্টা পর দেখা গেল কুয়াশা কেটে গেছে। নীল আকাশটা যেখানে আরও ঘন নীল সাগরে মিশেছে, সেখানে আরেকবার তাকাল সেরেসান্তে। সাগর এখনও পুরোপুরি শান্ত নয়, তবে এখন আর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে নেই। তাকিয়ে আছে, হঠাৎ কি যেন একটা দেখতে পেল সেরেসান্তে। একটা জাহাজ না? হ্যাঁ, জাহাজই তো!

উত্তেজিত হয়ে উঠলেও, একটু পর শান্ত হয়ে গেল সেরেসান্তে। কারণ জাহাজটা এদিকে আসছে না, নিজের পথ ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চলে যাচ্ছে। বেলা এখন দুটো। যতক্ষণ দেখা গেল জাহাজটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে।

জাহাজটা অদৃশ্য হবার পর আরও ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে। এখনও সাগরের ওপর চোখ বোলাচ্ছে সেরেসান্তে। এবার উত্তর-পুব দিকে কালো মত কি যেন একটা দেখতে পেল সে। তারপর জিনিসটা চিনতে পারল। কালো ধোঁয়া!

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সেরেসান্তে। ওটা যে একটা

স্টীমার, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। এদিকে, অর্থাৎ স্টাটেন আইল্যান্ডের দিকেই আসছে। তার একবার সন্দেহ হলো, সান্তা ফে ফিরে আসছে। তারপর ভাবল, না, তা কি করে হয়! সান্তা ফের আসার কথা মার্চ মাসের প্রথম দিকে। আজ ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখ। তবু মনটা তার খুঁত খুঁত করতে লাগল। এমন কি হতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে সান্তা ফে? একটা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল সেরেসান্তেকে। তারা কি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে?

লণ্ঠন-ঘরের জানালা দিয়ে নিচে তাকাল সেরেসান্তে। শান্ত সাগরে নোঙর ফেলে রয়েছে তাদের স্কুনার 'সেরেসান্তে'। সব রকম প্রস্তুতি নেয়া শেষ, এখন শুধু নোঙর তুলে রওনা হলেই হয়। না, একটু ভুল হলো। প্রস্তুতি শেষ হলেও এখুনি রওনা হওয়া সম্ভব নয়। রওনা হতে হলে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এর মানে হলো, স্টীমারটা কাছে চলে আসার আগে এই দ্বীপ ছেড়ে তারা চলে যেতে পারছে না। আর স্টীমারটা যদি সান্তা ফে হয়, তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

নিশ্চিত না হয়ে কনগ্রেকে রিপোর্ট করতে চাইছে না সেরেসান্তে। স্টীমারের স্পীড খুব বেশি। এই স্পীডে আসতে থাকলে সান হুয়ান অন্তরীপে একটু পরই পৌঁছে যাবে। চোখে টেলিস্কোপ আটকে অপেক্ষা করছে সে।

খানিক পর স্টীমারটা অনেক কাছে চলে এল। বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করল সেরেসান্তে। না, ওটা সান্তা ফে হতেই পারে না। এটা খুব ছোট একটা স্টীমার।

স্টাটেন আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওটা। সাগর

আবার খালি হয়ে গেল। টেলিস্কোপ চোখে থাকলেও স্টীমারটার নাম পড়া যায়নি, সেজন্যে সামান্য একটু অস্বস্তিবোধ করছে সেরেসান্তে। তবে এ নিয়ে আর কিছু না ভেবে নিচে নেমে এল সে।

এক সময় জোয়ার শুরু হলো। স্কুনার 'সেরেসান্তে' এবার নোঙর তুলবে। শিষ্যদের নিয়ে ঠিক ছ'টার সময় জাহাজে চড়ল কনগ্রে। 'সবাই তৈরি হও,' নির্দেশ দিল সে। কর্কশ ধাতব আওয়াজ তুলে পানি থেকে উঠে এল নোঙরগুলো। এরপর পাল তোলা হলো। স্কুনার কাঁপছে। ধীরে ধীরে সচল হলো। খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে ওরা। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে ছুটে আসা বাতাস ওদের অনুকূলে। এদিকের জলপথ সত্যি খুব ভাল করে চেনে কনগ্রে। জাহাজ চালাতে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল অন্তরীপের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে স্কুনার। ওদের সামনে সীমাহীন সাগর পড়ে আছে। পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

সেরেসান্তেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার চেহারা। হাসতে হাসতে কনগ্রেকে বলল, 'আগেপিছে কোথাও কোন বাধা নেই, ওস্তাদ। আর একটু পরই উপসাগর থেকে বেরিয়ে যাব আমরা, কি বলো?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল কনগ্রে। 'আশা করছি আর বিশ মিনিটের মধ্যে সান হুয়ান অন্তরীপকে পিছনে ফেলতে পারব।'

এই সময় শিষ্যদের একজন আঁতকে উঠে বলল, 'ওস্তাদ, এদিকে এসো। দেখো তো, কি ওগুলো।'

ছুটে লোকটার পাশে চলে এল সেরেসান্তে। রেইলিং ধরে

ঝুকল সে। জাহাজ এই মুহূর্তে ওদের সেই গুহাটার পাশ দিয়ে এগোচ্ছে। সাগরে চোখ বুলিয়ে সেরেসান্তে দেখল, ভাঙা মউল-এর বেশ অনেকগুলো টুকরো পানিতে ভাসছে। সে-ও আঁতকে উঠল। সরাসরি ওগুলোর দিকেই এগোচ্ছে ওরা। এখন যদি সংঘর্ষ ঘটে, জাহাজের মারাত্মক ক্ষতি হবে। ওগুলো সরিয়ে পথ পরিষ্কার করবে, সে সময় বা সুযোগও নেই। তাড়াতাড়ি কনগ্রেকে ডাকল সে, হাত তুলে টুকরোগুলো দেখাল তাকে।

দ্রুত জাহাজটাকে তীরের দিকে সরিয়ে আনল কনগ্রে। মউল-এর ভাঙা অংশগুলো ওটাকে পাশ কাটিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। বিপদ কেটে যাবার পর আবার উপসাগরের মাঝখানে চলে এল স্কুনার। অন্তরীপের শেষ মাথার পাহাড়টা কাছে চলে এল। আর পঞ্চাশ কি ষাট গজ যেতে পারলে পাহাড়টার কোণ ঘুরে উপসাগর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে তারা।

বাতাসে হঠাৎ শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল কনগ্রে। অকস্মাৎ বিস্ফোরণের শব্দে হতভম্ব হয়ে গেল জলদস্যুরা। প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁকি খেলো স্কুনার। তীরে, টিলার মাথায়, খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল।

বাঘের মত গর্জে উঠল কনগ্রে। 'সেরেসান্তে! কি ঘটছে?'

'কামানের গোলা, ওস্তাদ!' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সেরেসান্তে। 'কেউ আমাদেরকে টার্গেট করে কামান দাগছে।'

গোলাটা কোথায় পড়েছে দেখার জন্যে ছুটে এল কনগ্রে। রেইলিং ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে হলো তাকে। জাহাজের গায়ে পানির যে রেখা, সেই রেখা থেকে দুই ফুট ওপরে বিরাট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

উপসাগর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে স্কুনার, এই সময় গর্জে উঠল কামান। আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করল জলদস্যুরা। দ্বিতীয় গোলাটা আর সামান্য নিচে আঘাত করলে জাহাজটাকে আর পানির ওপর ভেসে থাকতে হত না।

দ্রুত চিন্তা করছে কনগ্রে। এখন তার কি করা উচিত? নৌকা নিয়ে তীরে যাবে, গোলন্দাজকে খুন করার জন্যে? কিন্তু গোলন্দাজ কি একজন, নাকি সংখ্যায় তারা বহু? না, এত বড় ঝুঁকি নেয়া চলে না। প্রথম কাজ কামানের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তারপর জাহাজটাকে মেরামত করতে হবে।

চিন্তায় বাধা পড়ল আরেকটা গোলা ছুটে আসায়। 'সেরেসান্তে' আবার ঝাঁকি খেলো। প্রথম গোলার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি নিচে পড়ল সেটা। সর্বনাশ! আরেকটু নিচে পড়লে পানি ঢুকবে খোলে!

স্কুনার নিয়ে পালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে কনগ্রে। তার ধারণা উপসাগর থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলেই এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। পাহাড় ঘুরে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল স্কুনার। কামানটা আর গর্জায়নি। পাহাড়ের আড়াল পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কনগ্রে। জাহাজের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে জানা দরকার। কিন্তু তা জানতে হলে জাহাজের মাল-পত্র সব নামাতে হবে। এই খোলা সাগরে তা সম্ভব নয়। ভার্গাসকে নিয়ে নৌকায় উঠল কনগ্রে, ঘুরে ঘুরে জাহাজের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করছে।

জাহাজের গায়ে একজোড়া গর্ত তৈরি হয়েছে। তাতে যে

জাহাজটা এখুনি ডুবে যাবে, তা নয়। কিন্তু এই গর্ত নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। বড় বড় ঢেউ উঠলে অন্তত একটা গর্ত দিয়ে জাহাজের খোলে হু হু করে পানি ঢুকবে। ওটা বন্ধ করতে না পারলে মাঝ সাগরে ডুবে মরতে হবে তাদেরকে।

'কিন্তু কুত্তাগুলোর পরিচয় কি?' হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল সেরেসান্তে। 'নাগালের মধ্যে পেলে ওদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খেতাম!' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

'কে আবার, নিশ্চয়ই সেই তৃতীয় রক্ষী,' বলল ভার্গাস। 'তার সঙ্গে সেনচুরির দু'একজন লোকও থাকতে পারে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল সেরেসান্তে। 'কামানটাও সেনচুরিরই হবে। কিন্তু, আশ্চর্য, ভাঙা সেনচুরির চারপাশে আমরা তো কোন কামান দেখিনি।'

'এ-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন আর লাভ কি,' বলল কনগ্রে। 'চিন্তা করে বের করো জাহাজটাকে মেরামত করা যায় কিভাবে।

'কিন্তু ওস্তাদ, মেরামত করতে হলে তো প্রথমে জাহাজটাকে কোথাও ভেড়াতে হবে, তাই না? আমি বলি কি, পয়েন্ট দিয়াগোর অন্য তীরে নোঙর ফেলা হোক। ওদিক ছাড়া অন্য কোন দিকে যেতে চাইলে জোরালো বাতাসের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা আছে, সেক্ষেত্রে গর্ত দিয়ে জাহাজের ভেতর পানি ঢুকতে পারে। তাছাড়া, হঠাৎ যদি আবহাওয়া খারাপ হয়ে ওঠে?'

খানিক চিন্তা-ভাবনা করে কনগ্রে সিদ্ধান্ত নিল, রাতের অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই ইগোর উপসাগরে ফিরে যাবে তারা। কিন্তু দেখা গেল এই ভরা জোয়ারের সময় স্রোতের উল্টোদিকে

জাহাজ চালানো সম্ভব নয়। উপায় নেই, জোয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে।

ঢেউয়ের আঘাতে দোল খাচ্ছে স্কুনার। জলদস্যুরা বুঝতে পারছে, লক্ষণ ভাল নয়। জাহাজ যদি আরেকটু কাত হয়, গর্ত দিয়ে হু হু করে ভেতরে পানি ঢুকবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত সেরেসান্তের প্রস্তাব মেনে নিয়ে দিয়াগো পয়েন্টেই নোঙর ফেলতে রাজি হলো কনগ্রে।

রাত নামছে। একটু পর গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে সাগর। সেই অন্ধকারে তাদের 'সেরেসান্তে' ডাঙার সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে।

তবে কোন বিপদ হলো না। মাঝরাতের আগেই ইগোর উপসাগরে, আগের সেই পুরানো জায়গায় ফিরে এল স্কুনার। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা এই দ্বীপে ঘাঁটি গেড়েছিল, দ্বীপটা এখন যেন তাদেরকে ছাড়তে চাইছে না।

বারো

জলদস্যুদের মনের অবস্থা যে ভাল নয় তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। ঠিক যখন তাদের এত সাধের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত! রাগ না হয়ে যায়? এদিকে শুধু

যে কামানের গোলা ছুঁড়ে তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে, তা নয়–ওদিক থেকে ছুটে আসছে সান্তা ফে। আর খুব বেশি হলে চার কি পাঁচদিন, তারপরই ইগোর উপসাগরে পৌঁছে যাবে আর্জেন্টিনা সরকারের জাহাজটা। একেই বলে বিপদের ওপর বিপদ।

কাজেই দাঁতে দাঁত ঘষছে দস্যুসর্দার কনগ্রে। এমন রাগাই রেগে আছে, ভয়ে কেউ তার ধারে কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না, যদি কামড়ে দেয় বা ভেঙচি কাটে!

'সেরেসান্তে'-র ক্ষতির পরিমাণ আরেকটু কম হলে অন্য কোথাও গিয়ে নোঙর ফেলতে পারত কনগ্রে। কিন্তু জাহাজের জখম অত্যন্ত মারাত্মক, তাই যত দ্রুত সম্ভব মেরামত না করলেই নয়। তাছাড়া, স্টাটেন আইল্যান্ড ছাড়া জাহাজটাকে নিরাপদে রাখার আর কোন জায়গাও তো আশপাশে নেই।

কনগ্রের মত সেরেসান্তেও গনগনে আগুন হয়ে আছে, পারলে যেন নিজের হাতটাকেই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। সে একবার জেদ ধরেছিল, তাকে অনুমতি দেয়া হোক, কামানের গোলা ছোঁড়ার জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে খুঁজে বের করে জীবনের মত শিক্ষা দিয়ে আসুক। কিন্তু কনগ্রে অনুমতি দেয়নি। জবাবে বলেছে, দ্বীপে প্রতিপক্ষরা ক'জন আমরা জানি না। তাদের কাছে কি ধরনের অস্ত্র আছে তাও অজানা। কাজেই ঝুঁকি নেয়াটা বোকামি হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত সেরেসান্তেও তার যুক্তি মেনে নিয়েছে। লীডারকে সমর্থন করে বলল, 'ওদেরকে কুকুরের মত গুলি করে মারলেও তো আমাদের কোন লাভ হচ্ছে না। হ্যাঁ, মেরামতের কাজ

তাড়াতাড়ি সেরে দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়াই সবদিক থেকে ভাল।'

বাস্‌কেথ আর ডেভিসের খোঁজে সান হুয়ান অন্তরীপ জলদস্যুরা চষে ফেললেও কোন লাভ হত না, কারণ সেখানে ওরা নেই। ওরা তাহলে এখন কোথায়?

তার আগে বলা দরকার কাল বিকেলটা ওরা কিভাবে কাটিয়েছে। সময়টা ওরা কাটিয়েছে একটা টিলার ওপর, কামানের পাশে দাঁড়িয়ে। কামানটাকে টিলার ওপর তুলে আনতে কাল ঘাম ছুটে গেছে ওদের। কয়েক ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পর সন্ধে ছ'টার দিকে কাজটা শেষ করতে পারে। তোলার পর কামানের ব্যারেল উপসাগরের দিকে তাক করল, তারপর তাতে গোলা ভরল। কামান দাগার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে অপেক্ষায় ছিল ওরা, মুহূর্তের জন্যেও সাগরের ওপর থেকে চোখ সরায়নি। জলদস্যুদের স্কুনারটা নাগালের মধ্যে একবার এলে হয় শুধু, মজাটা দেখিয়ে দেবে।

'আমার প্ল্যানটা শোনো,' বাস্‌কেথকে বলল ডেভিস। 'অনেক মাথা খাটিয়ে এটা আমি তৈরি করেছি।'

'হ্যাঁ, বলো, আমি শুনছি।'

'জলদস্যুদের জাহাজ পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়াটা বোকামি হবে। কেন জানো? কারণ জাহাজ ডুবে গেলে সাঁতরে তীরে উঠবে ওরা, তারপর আমাদেরকে খুঁজতে শুরু করবে। অতগুলো হিংস্র লোকের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না।'

'তাহলে কি করতে চাও তুমি?'

'এমনভাবে গোলা ছুঁড়তে হবে, জাহাজের যাতে যথেষ্ট ক্ষতি হবে, কিন্তু ডুববে না। জাহাজের যথেষ্ট ক্ষতি হলে সাগর পাড়ি

দেয়ার মতলব বাতিল করতে হবে ওদেরকে। তখন আমাদেরকে খুঁজতে বেরোবার চেয়ে জাহাজটাকে মেরামত করার প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দেবে।'

'প্ল্যানটা তোমার মন্দ নয়,' স্বীকার করল বাস্‌কেথ। 'কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ যদি খুব কম হয়ে যায়? অল্প একটু মেরামতের কাজ সেরে আবার পালাতে চেষ্টা করবে না?'

'ওখানেই আমাদেরকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে,' বলল ডেভিস। 'গোলা ছুঁড়ে এমন ক্ষতিই করব, মাল-পত্র না নামিয়ে মেরামতের কাজে ওরা যেন হাত দিতে না পারে। মাল-পত্র নামাতে হলে পরে আবার তুলতেও হবে। তাতেই অন্তত দু'তিনদিন নষ্ট হবে ওদের।'

'কিন্তু যদি এমন হয়, সান্তা ফে পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেও এল না?'

ডেভিস হেসে উঠে বলল, 'যদি দেখি সান্তা ফে আসছে না, মেরামত করার পর জাহাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে জলদস্যুরা, তাহলে একই অস্ত্র আবার ব্যবহার করতে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কে?'

'মানে?'

'মানে, আবার আমরা গোলা ছুঁড়ে জখম করব স্কুনারটাকে!'

এবার বাস্‌কেথও হেসে উঠল।

'তবে,' ডেভিস বলল, 'যদি দেখি জাহাজটার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে দ্বিতীয়বার কামানটা ব্যবহার করার দরকার হবে না। সেক্ষেত্রে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব আমরা।'

দক্ষতার সঙ্গেই কামানের গোলা ছুঁড়েছে ওরা। তার পরিণতি

কি হয়েছে আমরা তা ইতিমধ্যে জেনেছি।

জখম নিয়ে জলদস্যুদের জাহাজ আবার স্টাটেন আইল্যান্ডের দিকে ফিরে আসছে দেখে দ্বীপের আরেক দিকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাস্‌কেথ আর ডেভিস। ওরা পালাচ্ছে জলদস্যুদের ভয়ে। ওদের খোঁজে এদিকে যদি আসে তারা! পালাবার প্ল্যানটা আগেই করা ছিল। টিলা থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল দু'জন। গুহা ছেড়ে মাইল দুয়েক উত্তরে যাবে, খুঁজে বের করবে নতুন একটা নিরাপদ আশ্রয়। শুধু যে ডাকাতদের ভয়ে পালাচ্ছে, তা নয়। ওদিক থেকে কোন জাহাজ এলে সেটাকে দেখতেও পাবে তারা। রওনা হবার সময় গুহা থেকে নিজেদের রসদ, অস্ত্র, গোলা-বারুদ ইত্যাদি সবই গুছিয়ে নিল ওরা।

দু'মাইল নয়, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাঁচ মাইল হাঁটতে হলো ওদেরকে। মোটামুটি ভালই একটা জায়গা পাওয়া গেছে। এখান থেকে সাগরের ওপর নজর রাখতে কোন অসুবিধে নেই, সান্তা ফে এলে পরিষ্কারই দেখতে পাবে। পয়লা মার্চের সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আড়াল থেকে খুনীগুলোর ওপর সতর্ক চোখ রাখল ওরা। ওদের সন্দেহ, জলদস্যুরা ওদেরকে না খুঁজতে বেরোয়।

কনগ্রে অবশ্য প্রতিপক্ষদের খোঁজার ব্যাপারে উৎসাহী নয়। সে তার লোকজনকে জাহাজ মেরামতের কাজে ব্যস্ত রাখল। সবাইকে বলে দেয়া হয়েছে, বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি সারতে হবে কাজটা। তারপরও ভার্গাসকে ঘন ঘন তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে। ভার্গাস এক সময় এসে রিপোর্ট করল, 'সবাই মিলে হাত লাগালে সন্ধের মধ্যে মেরামতের কাজ শেষ করা সম্ভব। তবে সব কাজ

নিখুঁতভাবে শেষ করতে হলে আরও একটা দিন লাগতে পারে।'

সন্ধের দিকে বাস্‌কেথ ও ডেভিস বুঝতে পারল, আজ আর জলদস্যুদের রওনা হবার সম্ভাবনা নেই। নতুন আস্তানায় ফিরে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন ভোর হবার আগেই আবার সৈকতে এসে দাঁড়াল, দিগন্তে কোন জাহাজ আছে কিনা দেখছে। সান্তা ফে, অন্য কোন জাহাজ, এমনকি এতটুকু ধোঁয়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বাস্‌কেথের ধারণা, আজ নিশ্চয়ই জলদস্যুরা রওনা হবে। ডেভিস খুব অস্থির হয়ে উঠল, সান্তা ফে এখনও আসছে না কেন! এবার রওনা হলে খুব সাবধানে জাহাজ চালাবে জলদস্যুরা, কামানের গোলা লাগানো সম্ভব হবে কিনা কে জানে। দু'জনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকল। সকাল হতে জোয়ার শুরু হলো, এক সময় তা চলেও গেল। এতক্ষণে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল ওরা। জোয়ারের সময় যখন জলদস্যুরা জাহাজ ছাড়েনি, ধরে নেয়া যায় সন্ধ্যার জোয়ার শুরু না হওয়া পর্যন্ত জাহাজের নোঙর তুলবে না।

আবহাওয়া একদম শান্ত। রোদের তাপ খুব মিষ্টি লাগছে। সাগরের পানিতে ঝিলিক মারছে আলোর ছটা।

মার্চের দুই তারিখটাও কোন ঘটনা ছাড়াই পার হয়ে গেল। জলদস্যুরা জাহাজ মেরামতের কাজে ব্যস্ত, অন্য কোন দিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই তাদের।

'ওরা পালাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না,' পায়চারি করতে করতে বলল ডেভিস।

'তোমার মাথায় তো আইডিয়া গিজ গিজ করে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখো না কিছু করা যায় কিনা,' বলল বাস্‌কেথ। 'আমার

ধারণা, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমরা। এখন ঈশ্বর যা চাইবেন তাই হবে।'

পায়চারি করছে ডেভিস, তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। কি যেন চিন্তা করছে সে।

বাস্‌কেথ বিড়বিড় করে বলল, 'পাপ করলে ভুগতে হয়। আমরা প্রতিশোধ নিতে না পারলেও ঈশ্বর ওদেরকে ক্ষমা করবেন না।'

বাস্‌কেথের কথায় যেন কান নেই ডেভিসের। এমনভাবে পায়চারি করছে, যেন খুব উত্তেজিত। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস্‌কেথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন হয়, বলো তো, আমরা যদি কাছাকাছি গিয়ে দেখি ওরা কি করছে?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো! তুমি মনে হচ্ছে স্বেচ্ছায় খুনীদের হাতে ধরা পড়তে চাও!'

'ধরা দেয়ার কথা কে বলছে!' ডেভিস একটু বিরক্ত হলো। 'কাছাকাছি থেকে দেখলে বোঝা যেত আজ সন্ধ্যার জোয়ারের সময় সত্যি ওরা রওনা হবে কিনা।'

'তা জেনে আমাদের লাভ?'

'কিছু না কিছু লাভ হতে বাধ্য,' বলল ডেভিস। 'আসলে, আমি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছি না, বাস্‌কেথ। এরকম অসহায়ভাবে কতক্ষণ থাকা যায়, বলো? আচ্ছা, বাতিঘর এখান থেকে ঠিক কতটা দূর?'

'সরাসরি ওই পাহাড় ডিঙিয়ে গেলে তিন মাইল।'

'আমি যাব, বাস্‌কেথ। প্লীজ, আমাকে তুমি বাধা দিয়ো না। চারটেয় রওনা হলে সন্ধের দিকে পৌঁছে যাব। তখনও আলো

থাকবে, তবে সাবধানে থাকলে ওরা আমাকে দেখতে পাবে না।'

ডেভিস ভেবেছিল বাস্‌কেথ তাকে বাধা দেবে। কিন্তু বাস্‌কেথ কিছু বলল না। বলল না এই জন্যে যে সে জানে বাধা দিয়ে ডেভিসকে আটকানো যাবে না। তাছাড়া, হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করতে তারও ভাল লাগছে না।

ডেভিস আবার বলল, 'তুমি এখান থেকে সাগরের ওপর নজর রাখো, বাস্‌কেথ। আমার ফিরে আসতে খুব একটা রাত হবে না।'

বাস্‌কেথ সংক্ষেপে বলল, 'তুমি একা যাচ্ছ না, ডেভিস, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না, এটা বিবেচনা করেই একসঙ্গে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। চারটে বাজতে এখনও দেরি আছে। সৈকতে ডেভিসকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল বাস্‌কেথ। পুরানো একটা সাদা শার্ট নিল সে, সেটাকে ফালি ফালি করে ছিঁড়ল, ছেঁড়া ফালিগুলো পরস্পরের সঙ্গে গিঁট দিয়ে লম্বা একটা রশি তৈরি করল। ধারাল একটা ছুরি বের করে কোমরে গুঁজল। হাতে থাকল দুটো রিভলভার আর কিছু খাবার। ডেভিসের কাছে ফিরে এসে একটা রিভলভার আর কিছু কার্ট্রিজ দিল বাস্‌কেথ। সৈকতে, একটা পাথরের আড়ালে বসে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নিল দু'জনে। খাচ্ছে, ডেভিস জানতে চাইল, 'হাতে তৈরি রশিটা খুব রহস্যময় লাগছে আমার। ভেঙে বলো দেখি, ব্যাপারটা কি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বাস্‌কেথ বলল, 'সন্ধ্যের সময় আবার জিজ্ঞেস কোরো।'

খাওয়া শেষ হতে যে যার রিভলভার চেক করে নিল ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল। নির্জন পাহাড় টপকে এগোচ্ছে ওরা, পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। মাইলখানেক হাঁটার পরই বাতিঘরের চূড়া দেখতে পেল ওরা। স্বভাবতই হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওদের। কোথাও না থেমে আরও আধ ঘণ্টা হাঁটল এভাবে। বাতিঘর আর যখন আধ মাইল দূরে, হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে সাবধানে এগোল ওরা। চারদিকে সজাগ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে। টাওয়ারের লণ্ঠন-ঘর থেকে এদিকে যদি কেউ তাকায়, ওদেরকে দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই।

লণ্ঠনটা ওরা পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। শুধুই লণ্ঠন, আশপাশে কেউ নেই। চলার পথে এখন পাথর আছে প্রচুর, সেগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। সামনে একটা ফাঁকা জায়গা পড়ল, আড়াল নেয়ার মত কিছুই নেই। জায়গাটা হামাগুড়ি দিয়ে পার হলো ওরা। ঠিক ছ'টার সময় পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে দেখল সামনেই বাতিঘর। সৈকতের কাছে জলদস্যুরা খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কি ব্যাপার? ব্যাপার হলো, জাহাজ মেরামতের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে তারা, তাই রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাহাজে মাল-পত্র তোলার কাজ আগেই শুরু হয়েছে, শেষ হতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না।

ডেভিসের শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। হিসহিস করে বলল, 'শালারা দেখছি পালাবার জন্যে তৈরি!' তার দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। 'বাস্‌কেথ, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে ওরা, অথচ আমরা কিছুই করতে পারব না?'

ডেভিসের মত বাস্‌কেথও অসহায়বোধ করছে। আসলে সত্যি ওদের কিছু করার নেই।

কনগ্রেকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ঠিকমতই রক্ষা করেছে ভার্গাস। জাহাজের প্রতিটি ক্ষত সারিয়েছে সে, সময়ও নিয়েছে খুব কম। সবচেয়ে বড় কথা, মেরামতের কাজে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে লোকটা—জাহাজের গায়ে জখমের কোন চিহ্নই এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাল-পত্র তুলতে যা দেরি, 'সেরেসান্তে' সঙ্গে সঙ্গে সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে রওনা হতে পারবে।

সময় তো আর কারও জন্যে বসে থাকে না, সে তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যাচ্ছে। সাগরের পানিতে ডুব দিল সূর্য। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। অথচ জলদস্যুদের মধ্যে রওনা হবার ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না। বাস্‌কেথ আর ডেভিস একটা টিলার ওপর, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এতটা দূর থেকে জলদস্যুদের মতিগতি ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না ওরা। তবে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। জলদস্যুরা হৈ-চৈ আর হাসাহাসি করছে। ভারী জিনিস-পত্র বয়ে নিয়ে যাবার সময় 'হেইয়ো হেইয়ো' করছে। রাত দশটা বাজল। হাসি আর হৈ-হট্টগোলের আওয়াজ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। পরিবেশটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তারমানে কি মাল-পত্র তোলার কাজ শেষ করে ফেলেছে ওরা? একটু পরই রওনা হবে?

কিন্তু রওনাই যদি হবে, নোঙর তুলছে না কেন? পালও তো দেখা যাচ্ছে খাটায়নি। 'সেরেসান্তে' সেই আগের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রহস্যটা কি?

আরও এক ঘণ্টা পার হলো। হঠাৎ বাস্‌কেথের একটা হাত

ধরল ডেভিস। 'শুনতে পাচ্ছ, বাস্‌কেথ? পানির আওয়াজ! জোয়ার শুরু হলো!'

'তোমার কি ধারণা, এবার ওরা রওনা হবে?'

'আজ যদি না-ও হয়, কাল তো হবেই।'

মাথা নাড়ল বাস্‌কেথ। 'না, ডেভিস। খুনীরা কালও রওনা হতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এই দ্বীপ ছেড়ে কোনদিই ওরা যেতে পারবে না।' পাথরের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সে।

হতভম্ব হয়ে তার পিছু নিল ডেভিস। দু'জনেই বাতিঘরের দিকে হাঁটছে। কয়েক মিনিট লাগল টাওয়ারের নিচে পৌঁছাতে। মাটিতে কি যেন হাতড়াচ্ছে বাস্‌কেথ। সম্ভবত একটা বড় আকারের পাথরই হবে, মাটি থেকে তুলে সরিয়ে রাখল। যেখানে পাথরটা ছিল এখন সেখানে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। কষ্ট হবে, তবে চেষ্টা করলে দু'জন মানুষ ঢুকতে পারবে ভেতরে। ডেভিসের কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করল বাস্‌কেথ, 'গর্তে নামো।'

'কি ব্যাপার, বাস্‌কেথ?' ডেভিস ইতস্তত করছে।

'বাতিঘরে থাকার সময় হঠাৎ এই গর্তটা আবিষ্কার করেছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল, এটা একদিন হয়তো কাজে লাগবে।'

আর কোন প্রশ্ন না করে গর্তের ভেতর ঢুকল ডেভিস। তাকে অনুসরণ করল বাস্‌কেথ। গর্তটা খুব একটা বড় নয়, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কোন রকমে থাকতে পারবে দু'জনে। বাস্‌কেথ বলল, 'এখানে তোমাকে রেখে আমি একটু ঘুরে আসি। আমি না

ফেরা পর্যন্ত এই গর্ত ছেড়ে তুমি বেরুবে না।'

'ঘুরে আসবে? কি বলছ!' ডেভিস অবাক। 'কোথায় যাবে তুমি?'

'ডাকাতদের জাহাজে যাচ্ছি আমি,' বাস্‌কেথ বলল। 'তুমি এখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'তুমি একা ওদের জাহাজে যাবে?' ডেভিস যেন বাস্‌কেথের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'হ্যাঁ, একাই,' দৃঢ় গলায় বলল বাস্‌কেথ। 'এখন আমাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, খুনীরা যাতে দ্বীপ ছেড়ে পালাতে না পারে।' পকেট থেকে একজোড়া ছোট পুঁটলি বের করল সে, কোমরের বেল্ট থেকে ছুরিটাও খুলে নিল।

'পুঁটলিতে কি?' জানতে চাইল ডেভিস।

'বারুদ দিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করেছি,' বলল বাস্‌কেথ। 'ডিনামাইটের মতই ফাটবে। দেখছ, শার্ট ছিঁড়ে রশির মত বানিয়েছি? এগুলো আসলে সলতে। এখন আমি কি করব শোনো। পুঁটলি দুটো মাথায় বাঁধব, তীর থেকে পানিতে নেমে সাঁতরে উঠব জাহাজে। মাস্তুলের কাছে পুঁটলি দুটো রাখব, তারপর সলতেতে আগুন ধরিয়ে ফিরে আসব। কি, সম্ভব নয়?'

'বুদ্ধিটা তো চমৎকার!' হঠাৎ উল্লসিত বোধ করছে ডেভিস। 'হ্যাঁ, সম্ভব। কিন্তু এই বিস্ফোরক কখন তুমি তৈরি করলে?'

'দুপুরবেলা। মনে আছে, তোমাকে সৈকতে পাহারায় রেখে আস্তানায় গিয়েছিলাম আমি? তখন।'

'ও, আচ্ছা। কিন্তু, দোস্ত, এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে আমি তো তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না। তুমি গেলে

আমাকেও তোমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'শুধু শুধু দু'জনেই কেন ঝুঁকি নিই? আমি তোমার সাহায্য ছাড়াই কাজটা করতে পারব।'

কিছুক্ষণ তর্ক করল ওরা। ডেভিস বুঝতে পারল, বাস্‌কেথকে টলানো যাবে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাকে একা যেতে দিতে রাজি হলো সে।

ইতিমধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে অন্ধকার। গায়ের শার্ট খুলে ফেলল বাস্‌কেথ, জরুরী মাল-মশলা নিয়ে গর্ত থেকে বেরুল। চারদিকটা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল সে। সাগরের আওয়াজ পাচ্ছে, পথ চিনতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতেও পাচ্ছে না। পানিতে নামার সময় কোন শব্দ করল না। সাঁতার কেটে এগোচ্ছেও খুব সাবধানে। জোয়ারের সময়। পানি এমনিতেই আওয়াজ করছে, ওর তৈরি শব্দ তাতে চাপা পড়ে যাবার কথা।

নিরেট কালো একটা পাঁচিলের মত সাগরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজটা। প্রথমে ডেকটা খালিই দেখল বাস্‌কেথ। ভাবল, এই সুযোগে জাহাজে উঠে পড়া যায়। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল, রেইলিং ধরে কে যেন একধারে বসে আছে। নিশ্চয়ই জলদস্যুরা লোকটাকে পাহারায় রেখে গেছে। জাহাজে উঠতে ভয় পাচ্ছে বাস্‌কেথ। কি করবে ভাবছে। হঠাৎ কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। না, ভয়ের কিছু নেই, লোকটা বেসুরো গলায় গান ধরেছে। একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারল, গান গাইছে ওই পাহারাদার ডাকাতটাই।

জাহাজের নোঙর ধরে ওপরে উঠছে বাস্‌কেথ। লোহার শিকল

ঝাঁকি খাওয়ায় ধাতব শব্দ হলো। ভয় পেয়ে জাহাজের গায়ে সেঁটে থাকল ও। ভাগ্য ভাল যে লোকটা মনের আনন্দে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এবার আরও সাবধানে উঠতে চেষ্টা করল বাস্‌কেথ। গতি খুব মন্থর। তা হোক, তবু ধরা পড়ার ঝুঁকি নেয়া চলবে না। লোকটা নিজেকে দম ফেলার সুযোগও দিচ্ছে না, গেয়েই চলেছে। এক সময় রেইলিঙের কাছে পৌঁছে গেল বাস্‌কেথ।

বিস্ফোরক ভরা পুঁটলি দুটো সাবধানে মাস্তুলের পাশে, ডেকের ওপর রাখল ও। পুঁটলির ভেতর সলতে ঢুকিয়ে দেশলাই বের করল। সতর্ক ছিল, তাই পানিতে দেশলাই ভেজেনি।

দেশলাই জ্বেলে সলতেতে আগুন দিল বাস্‌কেথ। কাজটা শেষ করেই নোঙর বেয়ে নামতে শুরু করল। মনটা উল্লাসে নাচছে, স্বপ্নেও ভাবেনি এত সহজে কাজটা করতে পারবে। অকস্মাৎ ঝপাৎ করে জোরালো একটা আওয়াজ! নোঙর থেকে হাত খসে গেছে, সোজা সাগরে পড়েছে বাস্‌কেথ।

গান থেমে গেল। 'কে?' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

পানির ওপর মাথা তুলে বাস্‌কেথ দেখল রেইলিং ধরে ঝুঁকে পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, বোঝার চেষ্টা করছে কিসের আওয়াজ হলো। পানির নিচে ডুব দিল বাস্‌কেথ। ডুব সাঁতার দিয়ে দ্রুত সৈকতের দিকে ফিরে আসছে।

প্রায় এক মিনিট রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। নিচের পানিতে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। বিড় বিড় করে কাকে কে জানে একটা গাল দিল, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে আবার গান ধরল।

ডেভিসের মনে হলো সে যেন অনন্তকাল ধরে বাস্‌কেথের অপেক্ষায় গর্তে বসে আছে। ত্রিশ মিনিট পার হলো, তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট, অবশেষে এক ঘণ্টা। আশ্চর্য, বাস্‌কেথ এখনও ফিরছে না কেন? অস্থির হয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ডেভিস। বাস্‌কেথের কি কোন বিপদ হলো? এত দেরি হবার তো কথা নয়।

ডেভিস গর্ত থেকে বেরুতেই অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তারপর শোনা গেল বহু লোকের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ।

পানি থেকে উঠে এল এক লোক। ডেভিস দেখল তার দিকেই ছুটে আসছে লোকটা। একটু পরই বাস্‌কেথকে চিনতে পারল সে। 'দোস্ত!' বলে তাকে জড়িয়ে ধরল সে। বাস্‌কেথ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডেভিসের একটা হাত ধরল, তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার ভেতর। ঢোকার আগে পাথরটাকে টেনে এনে গর্তের মুখে এমনভাবে রাখল, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও যাতে বোঝা না যায় যে এখানে একটা গর্ত আছে।

একটু পর কর্কশ একটা গলা ভেসে এল, পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা। 'এদিকে, এদিকে এসো! কুত্তাটাকে এবার ঠিকই ধরব আমরা। পালিয়ে যাবে কোথায়!'

অন্য একটা গলা ভেসে এল, 'যীশুর কিরে বলছি, তাকে আমি স্পষ্টই দেখেছি। সঙ্গে কেউ ছিল না, একা এসেছিল।'

'একটু আগেই যখন দেখেছ, তাহলে বেশি দূর যেতে

পারেনি।'

'এসো, খোঁজা যাক। ওর মুণ্ডুটা আমার চাই...'

লোকগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, এক সময় আর তাদের কথা শোনা গেল না।

ডেভিস নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাজ হয়েছে, তাই না?'

'সম্ভবত। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট কিনা।'

'তোমার বিস্ফোরক যে এত জোরাল আওয়াজ করবে, আমার ধারণা ছিল না। ক্ষতি খুব বেশি হবারই কথা।'

'আমি চাই আরও অন্তত দু'হপ্তা ওরা যেন দ্বীপ ছেড়ে যেতে না পারে।'

'ইতিমধ্যে সান্তা ফে চলে আসবে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ফিসফিস করল বাস্‌কেথ। 'চুপ!'

কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ। এদিকেই এগিয়ে আসছে। এল, তারপর গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে চলেও গেল। আটকে রাখা দম ছাড়ল ওরা।

সারা রাতই পাগলা কুকুরের মত ওদেরকে খুঁজে বেড়াল জলদস্যুরা। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, এতক্ষণে হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করল তারা। অন্ধকারে কতক্ষণ আর ঘুরে মরবে? একে একে নিজেদের ডেরায় ফিরে গেল তারা।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ পাচ্ছে না বাস্‌কেথ ও ডেভিস। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। এবার

গর্তটা থেকে বেরিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফেরা দরকার। কিছু খেতে হবে, ঘুমাতেও হবে।

গর্ত থেকে বেরুতে যাবে ওরা, হঠাৎ আবার দু'জন লোকের গলা শুনতে পেল। গর্তের দিকেই এগিয়ে আসছে তারা।

'সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার। লোকটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

অপর লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বলতে হবে। কিন্তু আর কিছু করার নেই আমাদের। সম্ভাব্য সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। লোকটা সম্ভবত ছুটে দ্বীপের উল্টোদিকে চলে গেছে। আশপাশে থাকলে ঠিকই আমরা তাকে দেখতে পেতাম। এখন কি করবে বলো? সবাই তো জাহাজে ফিরে গেছে, আমরা শুধু শুধু কেন ঘুরে মরছি?'

'নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে বিস্ফোরণে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি জাহাজের। সম্ভবত ডিনামাইটই বসিয়েছিল। ঠিকমত লাগলে জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। হ্যাঁ, চলো জাহাজে ফিরে যাই আমরা।'

বাস্‌কেথ আর ডেভিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জাহাজের তাহলে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি! তারমানে জলদস্যুরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারবে!

লোকগুলো এখনও কথা বলছে।

'কুত্তাটা আসলে চেয়েছিল মাস্তুলটা যাতে ভেঙে পড়ে, তাহলেই আমরা আর জাহাজ নিয়ে খোলা সাগরে বেরুতে পারতাম না। আমি ভাবছি, সে কি দূর থেকে লক্ষ করছে জাহাজটাকে? মাস্তুল অটুট থাকায় আবার হামলা করবে?'

'অত সাহস কি তার হবে? মনে হয় না। মাথায় ঘিলু থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে বিস্ফোরক জাহাজ থেকে হাউই-এর মত ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াতেই তার হামলা ব্যর্থ হয়েছে। সে জানে, আমরা এখন সজাগ। কাজেই দ্বিতীয় বার আসতে সাহস পাবে না।'

'তুমি কি দেখেছ, ডেকের কতটা ক্ষতি হয়েছে?'

'দেখেছি। একদিকের ডেক খানিকটা উড়ে গেছে। গুরুতর কোন ক্ষতি বলা চলে না।'

এই সময় দূর থেকে অন্য আরেকটা গলা ভেসে এল, 'এই, তোমরা ওখানে কি করছ? লেকচার মারলেই হবে, নাকি কিছু কাজও করবে? চলে এসো তোমরা, জাহাজে ওঠো।'

লোক দু'জন চলে যেতে গর্তের ভেতর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাস্‌কেথ আর ডেভিস। বাস্‌কেথ তো নিঃশব্দে কেঁদেই ফেলল। 'না, ডেভিস, ভাগ্য আমাদের পক্ষে নয়। ওদেরকে আটকানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।'

ডেভিস নিজেও হতাশ। বাস্‌কেথকে সে আর কি সান্ত্বনা দেবে। প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে একটা কাজ করতে গেল বেচারা, কিন্তু কোনই লাভ হলো না। কাল ভোরেই জলদস্যুরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে।

একটু পরই ভোর হয়ে এল। আলো ফুটছে, তাই গর্তটা থেকে ওরা বেরুতে পারল না। বাস্‌কেথ খুব ভয় পাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে জলদস্যুরা গর্তটা দেখতে পায়নি, কিন্তু দিনের আলোয় পাবে। ডেভিসের সাহায্য নিয়ে পাথরটাকে আরও কাছে

টেনে আনল ও, ফলে গর্তের মুখ প্রায় পুরোটাই চাপা পড়ে গেল।

সকাল হলো। ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছে। জলদস্যুদের কোন সাড়া-শব্দ নেই। গর্তের ভেতর গরমে সেদ্ধ হচ্ছে ওরা। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। কিন্তু সাহস করে বেরুবার কথা একবারও ভাবছে না ওরা। এক সময় দুপুর হলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। জাহাজটা এখনও রওনা হয়নি, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। রওনা হবার আগে নোঙর তুলতে হবে। আর নোঙর তুললে ধাতব শব্দ শোনা যাবে। বাস্‌কেথ আর ডেভিস ধারণা করল, সন্ধ্যার পর জোয়ারের সময় জাহাজ ছাড়বে তারা।

সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। দু'জনেই ঢুলছে। হঠাৎ চমকে উঠল ধাতব ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনে। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা চিনতে পারল ওরা। পানি থেকে জাহাজের নোঙর তোলা হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, এবার খুনীগুলো দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে।

অসহায় রাগে দিশেহারা বোধ করছে বাস্‌কেথ। পরিস্থিতি ভুলে পাথরটা সরিয়ে ফেলল সে, গর্ত থেকে মাথা তুলে উঁকি দিল বাইরে।

সূর্য এরইমধ্যে পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। বাস্‌কেথ দেখল—না, এখনও স্কুনারের নোঙর তোলা হয়নি। তবে তোলার আয়োজন চলছে পুরোদমে। বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখান থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না। জলদস্যুদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে না তারা চিন্তিত। না, তেমন কোন ক্ষতি সত্যি হয়নি।

গর্ত থেকে বেরুল বাস্‌কেথ। একটা পাথর দেখতে পেয়ে গা

ঢাকা দিল সেটার আড়ালে। উঁকি দিয়ে জলদস্যুদের গতিবিধি লক্ষ করছে। ডেভিসও এবার বেরিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়াল।

জলদস্যুরা প্রায় সবাই জাহাজে উঠে পড়েছে। দু'একজন শিষ্যকে নিয়ে তীরে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কনগ্রে। শিষ্যদের মধ্যে সেরেসান্তেও রয়েছে। নিজেদের মধ্যে কি বিষয়ে যেন আলাপ করল তারা, তারপর সেরেসান্তেকে নিয়ে বাতিঘরের দিকে হাঁটা ধরল কনগ্রে।

'সাবধান!' ডেভিসকে সাবধান করে দিল বাস্‌কেথ। 'ওরা কিন্তু এদিকেই আসছে।'

সেরেসান্তে বাতিঘরে যাচ্ছে টাওয়ারে উঠে শেষ একবার চারদিকে চোখ বোলাবার জন্যে। জাহাজ তৈরি, এখুনি তারা রওনা হবে। রওনা হবার আগে সাগরটা অবশ্যই একবার দেখা দরকার। যদি দেখা যায় এদিকে কোন জাহাজ আসছে, সতর্ক হবার সময় পাওয়া যাবে।

সেরেসান্তের মনে হলো, রাতটা শান্তই থাকবে, কোন ঝড়-টড় উঠবে না। বাতাসে তেমন জোর নেই, সাগরও প্রায় শান্ত।

টাওয়ারে উঠে লণ্ঠন-ঘরে ঢুকল সেরেসান্তে। বাতিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কনগ্রে, ভেতরে ঢোকেনি সে।

পাথরের আড়াল থেকে টাওয়ারের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে বাস্‌কেথ আর ডেভিস। সেরেসান্তেকে জানালায় দেখতে পাচ্ছে ওরা।

চোখে দূরবীন তুলে সাগরে চোখ বোলাচ্ছে সেরেসান্তে।

দিগন্তের কাছে সাগর ও আকাশ এক হয়ে মিশে আছে, কালো ও ঝাপসা একটা রেখার মত লাগছে। দিনটা শেষ হতে চলেছে, সূর্যের আলো পড়ায় সাদা মেঘগুলো লাল হয়ে উঠেছে। সাগরের নীল পানিতে মেঘের প্রতিবিম্ব। শেষ হতে হতেও দিনটা শেষ হচ্ছে না। এখনও সাগর আলোকিত। শান্ত সাগরকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। কিন্তু সে সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় নেই সেরেসান্তের।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

নিচে চমকে উঠল কনগ্রে আর তার শিষ্যরা। সবাই একযোগে মুখ তুলে তাকাল। কি হলো? সেরেসান্তে চেঁচাচ্ছে কেন?

সেরেসান্তে আবার চিৎকার করল। 'সান্তা ফে! সান্তা ফে!'

সান্তা ফে! কনগ্রের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

তেরো

মানুষের গলা থেকেও যে বজ্রপাতের মত আওয়াজ বেরুতে পারে, সেরেসান্তে সেটা প্রমাণ করে ছাড়ল। দুটো মাত্র শব্দ—সান্তা ফে—কিন্তু এই শব্দ দুটোর মধ্যে কি আতঙ্ক যে লুকিয়ে থাকতে পারে, জলদস্যুরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেল। সেরেসান্তের উচ্চারিত শব্দ দুটো অনেকক্ষণ তাদের কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত

হতে লাগল—সান্তা ফে! সান্তা ফে! সান্তা ফে! সান্তা ফে...

হতভম্ব কনগ্রে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এক চুল নড়ার শক্তি নেই। মুখ এমন সাদা হয়ে গেল, যেন একটা মড়া দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তার শিষ্যরাও কেউ এক চুল নড়ছে না। তাদের পায়ের তলায় যেন মাটি নেই।

সান্তা ফে আসছে! সান্তা ফে পৌঁছে গেছে!

সেরেসান্তে ভুল দেখেনি তো? জাহাজটা কি এদিকেই আসছে? ওটা কি সত্যি সান্তা ফে? সংবিৎ ফিরে পেতেই ছুটে বাতিঘরে ঢুকল কনগ্রে। সিঁড়ি বেয়ে ভরতর করে টাওয়ারে উঠল। লণ্ঠন-ঘরে ঢুকে খেঁকিয়ে উঠল, 'কই, কোথায়? জাহাজটা আমাকে দেখাও।'

জানালার দিকে একটা হাত তুলল সেরেসান্তে। 'ওই দিকে—উত্তর-পুবে তাকাও।'

সেদিকে তাকিয়ে সত্যি একটা জাহাজ দেখতে পেল কনগ্রে। 'দূরত্বটা আন্দাজ করতে পারো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু কম বেশি হতে পারে—এই ধরো মাইল দশেক।'

'তাহলে তো রাত নামার আগে দ্বীপে পৌঁছাতে পারবে না।'

'তা পারবে না। পৌঁছাবার আগেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।'

ছোঁ দিয়ে সেরেসান্তের হাত থেকে দূরবীনটা নিল কনগ্রে। সেটা চোখে তুলে আবার সাগরের দিকে তাকাল। চোঙ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ছে জাহাজটা। সোজা স্টাটেন আইল্যান্ডের দিকেই আসছে বটে। বেসুরো গলায় স্বীকার করল সে, 'হ্যাঁ, ভুল দেখোনি—সান্তা ফে-ই।'

'আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ, ওস্তাদ,' সেরেসান্তের গলায় রাজ্যের ক্ষোভ। 'দ্বীপে লুকিয়ে থাকা কুত্তারা দু'দু'বার বাধা দিয়েছে, তা না হলে এতক্ষণে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরে থাকতাম।'

'সে প্রসঙ্গ থাক, সেরেসান্তে,' বলল কনগ্রে। 'এখন কি করা হবে তাই বলো।'

'তুমিই বলে দাও, ওস্তাদ। আমার মাথা কাজ করছে না।'

'বিপদের সময় হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন! শোনো, এখুনি আমাদের রওনা হতে হবে।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ, এখুনি।'

'কিন্তু খানিক দূর গেলেই তো সান্তা ফের সামনে পড়ে যাব। ওরা তো এদিকেই আসছে।'

'এখন আসছে, একটু পর আর আসতে দেখবে না।'

'মানে?'

'এর মধ্যে কোন রহস্য বা ধাঁধা নেই। বাতিঘরের আলো জ্বলবে না, কিন্তু কেন জ্বলবে না তা সান্তা ফের ক্যাপটেন জানবে না। কাজেই দ্বীপে জাহাজ ভেড়াতে সাহস পাবে না সে।'

বাস্‌কেথ আর ডেভিসও তাই ধারণা করল, বাতিঘরের আলো জ্বলছে না দেখে সতর্ক হয়ে যাবেন ক্যাপটেন লাফায়েত, অন্ধকারে ঝুঁকি নিয়ে জাহাজ ভেড়াবেন না। সূর্য যেহেতু ডুবছে, নিয়ম অনুসারে এখুনি আলোটা জ্বলে ওঠার কথা। তা যখন জ্বলছে না, ক্যাপটেন খোলা সাগরেই নোঙর ফেলার সিদ্ধান্ত নেবেন। এই

দ্বীপে অনেকবারই এসেছেন তিনি, কিন্তু প্রতিবারই দিনের আলোয়। রাতের অন্ধকারে তীরের দিকে এগোলে যে বিপদ হবে, তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানে। তাছাড়া, বাতি জ্বলছে না দেখে এ-ও তিনি সন্দেহ করবেন যে রক্ষীদের নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। জানা কথা, দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করবেন তিনি।

বাস্‌কেথ তবু বলল, 'আমার মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করছে।'

'কেন?'

'ভাবছি সেনচুরির কপালে যা ঘটেছে, সান্তা ফের কপালে তা ঘটবে না তো? অন্তরীপের মুখে গিয়ে ওদেরকে সাবধান করে দিলে ভাল হয় না?'

ডেভিসও চিন্তায় পড়ে গেল। বাস্‌কেথের আশঙ্কা অমূলক নয়। সান্তা ফে যদি খোলা সাগরে নোঙর না ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে, পাথুরে সৈকতে ধাক্কা খাওয়া বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে জাহাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

'চলো, ডেভিস, সৈকতে যাই আমরা,' বলল বাস্‌কেথ। 'অন্তরীপের মুখে পৌঁছাতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে ঠিকই, তবে তখনও আলো জ্বেলে সঙ্কেত দেয়ার সময় পাব।'

ডেভিস ইতস্তত করে বলল, 'তোমার হিসেবে ভুল আছে, বাস্‌কেথ। অত সময় আমাদের হাতে নেই। আর বড়জোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাগরের মুখে পৌঁছে যাবে সান্তা ফে।'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদের এখন কিছুই করার নেই?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করা ছাড়া সত্যি আমাদের কিছু করার নেই।'

সন্ধে পার হতে চলেছে। চারদিকে ঘন হয়ে অন্ধকার নামছে।

জাহাজ ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জলদস্যুরা। সান্তা ফেকে আসতে দেখে সকাল পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টাটেন আইল্যান্ড ছেড়ে পালাতে হবে তাদের।

বাতাসটা অনুকূলেই বইছে এখন। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একবার যদি কোন রকমে খোলা সাগরে পৌঁছাতে পারে, সান্তা ফে তাদেরকে ধাওয়া করেও আর ধরতে পারবে না। হুঙ্কার ছাড়ছে কনগ্রে, সবাইকে জোর তাগাদা দিচ্ছে।

বাস্‌কেথ আর ডেভিস অক্ষম রাগে ছটফট করছে। অপরাধীরা হাত গলে বেরিয়ে যাবে, ওদের কি কিছুই করার নেই?

একটু পরই শিষ্যদের নিয়ে জাহাজে উঠল কনগ্রে। উঠেই নোঙর তোলার নির্দেশ দিল সে। সময় এখন সাড়ে সাতটা। পাথরের আড়াল থেকে নোঙর তোলার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল বাস্‌কেথ আর ডেভিস।

নোঙর তুলতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। জাহাজ দুলতে শুরু করেছে। এরইমধ্যে তুলে ফেলা হয়েছে সবগুলো পাল, বাতাস পেয়ে ফুলে উঠেছে সেগুলো। একেবারে মন্থরগতিতে উপসাগরের দিকে যাচ্ছে 'সেরেসান্তে'। মন্থরগতির কারণটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। বাতাস নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। পালগুলো এখন আর ফুলে নেই। জাহাজ চালাতে হলে পালে বাতাস থাকা চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজ চালানো কঠিন হয়ে উঠল। এরকম শান্ত সাগর আগে কখনও দেখা যায়নি। কোথাও একটা ঢেউ নেই। সারফেস যেন সমতল আয়না। বাতাসও পুরোপুরি অচল হয়ে গেল। এ অবস্থায় কোন স্কুনার চালানো সম্ভব নয়। পরিস্থিতির

পরিবর্তন না ঘটলে মাঝরাতের আগে কোনভাবেই সান হুয়ান অন্তরীপ পেরুনো যাবে না। সেক্ষেত্রে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে কনগ্রেকে। কিন্তু জোয়ার আসতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি। জোয়ার এলেও, সেটাকে ঠিক মত কাজে লাগানো যাবে কিনা, সেটা আরেক প্রসঙ্গ।

জাহাজ চলছে, তবে গতি একেবারেই কম। ইগোর উপসাগরের দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে তারা। মুশকিল হলো, এদিকটা ভাল করে চেনে না কনগ্রে। শুধু জানে, জায়গাটাকে 'জাহাজমারা উপকূল' বলা হয়।

বাতাস না থাকায় জাহাজ ঘুরিয়ে অন্য কোন দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। একে অন্ধকার, তারপর বিপজ্জনক ও কুখ্যাত উপকূল, জাহাজ চালাতে ভয় পাচ্ছে কনগ্রে। কিছু যদি করতে হয়, এখুনি। কোন বিপদ যদি ঘটে, তখন আর ভুল সংশোধন করা যাবে না। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিল কনগ্রে। তার সামনে একটা পথই খোলা ছিল, সেটাই গ্রহণ করতে হলো তাকে। স্কুনার থেকে কয়েকটা নৌকা নামানো হলো। দু'তিনজন করে লোক থাকল প্রতিটি নৌকায়। লোকগুলো অমানুষিক পরিশ্রম করছে—গুন টেনে মাঝসাগরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজটাকে।

মাঝ সাগরে পৌঁছাল বটে জাহাজ, কিন্তু এখানেও এক ফোঁটা বাতাস নেই। সবগুলো পাল নেতিয়ে পড়েছে। এখন এমন কি গুন টেনেও জাহাজটাকে উপসাগরের মুখে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই জোয়ারের অপেক্ষাতেই থাকতে হবে।

একটু পরই জোয়ারের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু জাহাজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, জোয়ার এলেও তার সাহায্য খুব একটা

পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, জোয়ারের উল্টোদিকে জাহাজ চালাবার কথা শুধু আহাম্মকরাই ভাবে। এখন তাহলে কি করবে কনগ্রে?

জলদস্যুদের জাহাজ দূরে গিয়ে নোঙর ফেলেছে, লক্ষ করে নিজেদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাস্‌কেথ আর ডেভিস। সৈকতে দাঁড়িয়ে জাহাজটার ওপর নজর রাখছে ওরা। বাতাস স্থির হয়ে আছে দেখে ওরা বুঝত পারল, আপাতত বেশ কিছুক্ষণ কনগ্রে নড়তে পারবে না। তবে ভোর হবার আগে নিশ্চয়ই আবার বাতাস বইতে শুরু করবে। তখন খোলা সাগরে পৌঁছাতে কোন সমস্যা হবে না।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল বাস্‌কেথ। 'এবার শালাদের বারোটা বাজাব!'

অবাক হয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে?'

'এখুনি দেখতে পাবে কিভাবে,' বলেই ডেভিসের হাত ধরে টান দিল বাস্‌কেথ। দু'জনে বাতিঘরের দিকে ছুটল।

ইতিমধ্যে রাত ন'টা বেজে গেছে। জোয়ারে উল্টোদিকে ভেসে যেতে পারে, তাই নোঙর ফেলা হয়েছে স্কুনারের। কনগ্রে ভাটা শুরু হবার অপেক্ষায় আছে। সেজন্যে তাকে রাত তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অকস্মাৎ জলদস্যুদের একজন আঁতকে উঠল। 'সর্বনাশ! আলো! বাতিঘরের আলো জ্বালল কে?'

লোকটার চিৎকার না করলেও চলত। বাতিঘরের আলো অকস্মাৎ জ্বলে উঠে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সাগরের বুক থেকে নিঃশেষে মুছে গেল সমস্ত অন্ধকার। উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

'সর্বনাশ! সর্বনাশ! সর্বনাশ!' নিজের মাথার চুল টান দিয়ে ছিঁড়ছে সেরেসান্তে।

'চোপ!' বাঘের মত গর্জে উঠল কনগ্রে। 'এখন মাথা খারাপ করার সময় নয়। এসো আমার সঙ্গে, তীরে নামতে হবে!'

'তীরে নামতে হবে?' হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সেরেসান্তে।

'এখুনি! তীরে নেমে বাতিঘরে ঢুকতে হবে। টাওয়ারে উঠে ঢুকতে হবে লণ্ঠন-ঘরে। ওখানে রক্ষী আর তার সঙ্গীদের খুন করে নেভাতে হবে আলোটা।' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে কনগ্রে।

'কিন্তু আমরা বাতি নেভাবার আগেই যদি সান্তা ফে দ্বীপের দিকে আসতে শুরু করে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল কনগ্রে। সেরেসান্তের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সান্তা ফে তীরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে, তখন কি হবে? পরের চিন্তা পরে, কনগ্রে সিদ্ধান্ত নিল, প্রথম কাজ বাতিটা নেভানো। আবার পানিতে নৌকা নামাবার নির্দেশ দিল সে।

নৌকা নামানো হলো। কয়েকজন জলদস্যু লাফ দিয়ে চড়ল সেটায়। সবাই তারা সশস্ত্র—কেউ নিয়েছে বন্দুক, কেউ রিভলভার, আবার কারও হাতে কুঠার। তীরে পৌঁছাতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। সবাই বাতিঘরের দিকে ছুটছে। তীর থেকে সেটা দেড় মাইল দূরে। পার হতে পনেরো মিনিট লেগে গেল।

বাস্‌কেথ আর ডেভিস তখনও লণ্ঠন-ঘরে। এখানে আসার আগে বাস্‌কেথের মনে সন্দেহ ছিল, বাতিটা জ্বলবে তো? কনগ্রে আতস কাঁচ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি যদি নষ্ট করে ফেলে থাকে,

তাহলে জ্বলবে না। তবে পরীক্ষা করে দেখার পর ভয়টা তার কেটে যায়। যন্ত্রপাতি বা আতস কাঁচ কনগ্রে নষ্ট করেনি। কাজেই বাতিঘরের আলো জ্বালতে ওদের কোন অসুবিধে হয়নি। আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে ঝলসে উঠে নিচের বিশাল এলাকা আলোকিত করে তুলল বাতিটা।

জলদস্যুরা ছুটে এসে বাতিঘরে ঢুকল। তারপরই বাধা পেল তারা। সিঁড়িতে উঠতে পারছে না, দরজা বন্ধ।

কনগ্রে নির্দেশ দিল, 'দরজা ভাঙো! যেভাবে হোক এখুনি টাওয়ারে উঠতে হবে আমাদের।'

কিন্তু সিঁড়িঘরের দরজা ইস্পাত দিয়ে তৈরি, ভাঙো বললেই কি ভাঙা যায়! অনেক চেষ্টা করেও জলদস্যুরা সুবিধে করতে পারছে না। ঘেমে নেয়ে উঠল তারা। বুঝতে পারছে, বৃথা চেষ্টা, এ দরজা ভাঙা সম্ভব নয়।

দরজার নাট-বল্টু খোলা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখছে সেরেসান্তে। তা-ও সম্ভব নয়, কারণ বল্টুগুলো ভেতর দিক থেকে আঁটা হয়েছে। এখন তাহলে কি করা হবে? টাওয়ারে ওঠার অন্য কোন পথ যদি না থাকে, জঙ্গলে গিয়ে লুকাতে হবে সবাইকে। আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই। জাহাজে ফিরে যাওয়াটা এখন হবে নিতান্তই বোকামি। হাতে সময়ও বেশি নেই, বাতি জ্বলতে দেখে সান্তা ফে নিশ্চয়ই তীরের দিকে ছুটে আসছে। এই মুহূর্তে আলোটা নেভাতে না পারলে বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। ভেতরে সুবিধে করতে না পেরে বাতিঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল তারা।

সেরেসান্তে হঠাৎ বলল, 'এদিকে লোহার একটা মই দেখতে পাচ্ছি!'

'নিয়ে এসো! তাড়াতাড়ি!'

মইটা টাওয়ারের গায়ে লাগানো হলো ঠিকই, কিন্তু এই মই বেয়ে টাওয়ারের অর্ধেকও পেরুনো যাবে না। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত লাগছে কনগ্রেকে। পায়চারি করছিল, হঠাৎ দেখল লোহার একটা পাইপ। পাইপটা টাওয়ারের একেবারে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে। 'এদিকে এসো,' সেরেসান্তেকে ডাকল সে, পাইপটা দেখিয়ে বলল, 'ওঠো!'

সেরেসান্তে আর ভার্গাস তখুনি পাইপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। তরতর করে দ্রুত উঠে গেল তারা। টাওয়ারের মাথায় পৌঁছাতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। এই সময় পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ হলো। টাওয়ারের ছাদ থেকে রিভলভার দিয়ে গুলি করছে বাস্‌কেথ আর ডেভিস।

গুলি খেয়ে পাইপ ছেড়ে দিল ভার্গাস আর সেরেসান্তে। ভারী বস্তার মত লাশ দুটো খসে পড়ল নিচে। আর ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ শব্দে সান্তা ফের বাঁশি বেজে উঠল। এই বাঁশির শব্দ আসলে একটা সঙ্কেত। সান্তা ফে বলতে চাইছে, তারা তীরের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে।

জলদস্যুদের এখন আর পালাবারও উপায় নেই। সান্তা ফে এখুনি নোঙর ফেলবে।

অন্ধকারে ছুটোছুটি করছে কনগ্রে আর তার শিষ্যরা। এক সময় তাদেরকে আর বাতিঘরের আশপাশে দেখাই গেল না।

একটু পরই রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে তীরের কাছাকাছি নোঙর ফেলল সান্তা ফে। আরও খানিক পর দেখা গেল বাস্‌কেথ

আর ডেভিস ওটার ডেক ধরে হাঁটছে।

চোদ্দ

বাস্‌কেথ আর ডেভিস সান্তা ফেতে চড়তেই ওদেরকে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠালেন ক্যাপটেন লাফায়েত। কুশলাদি জিজ্ঞেস না করে প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এত দেরি করে আলো জ্বালার কারণ কি, বাস্‌কেথ?'

বাস্‌কেথ জবাব দিল, 'প্রায় আড়াই মাস হতে চলল বাতিঘরের আলো একবারও জ্বলেনি, ক্যাপটেন। গত আড়াই মাসে আজই প্রথম আলোটা আমরা জ্বালতে পারলাম।'

'আড়াই মাস! কি বলছ তুমি? ফিলিপ আর মরিস কোথায়?'

'ওরা দু'জন খুন হয়ে গেছে, ক্যাপটেন। সান্তা ফে এখান থেকে চলে যাবার পর বাতিঘর দখল করে নিয়েছিল একদল জলদস্যু। বাতিঘরের একজন মাত্র রক্ষী বেঁচে আছে, স্যার।'

ডেভিস আর বাস্‌কেথ সব কথা খুলে বলল ক্যাপটেনকে। ধীরে ধীরে বর্ণনা করল কিভাবে খুন হলো ফিলিপ আর মরিস, বাস্‌কেথ কিভাবে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, সেনচুরি কিভাবে ধ্বংস হলো, ডেভিসকে কিভাবে উদ্ধার করল বাস্‌কেথ, কিভাবে কামান দেগে জলদস্যুদের পালিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে ওরা।

সবশেষে ডেভিস বলল, 'আজ রাতে বাতিঘরের আলোটা জ্বালাবার বুদ্ধি বাস্‌কেথের মাথাতেই আসে। আলো জ্বালা না হলে জলদস্যুরা এতক্ষণে জাহাজ নিয়ে অনেক দূরে চলে যেত।'

সব শুনে ক্যাপটেন লাফায়েত ওদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বাস্‌কেথ ও ডেভিসের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। বললেন, 'তোমরা সাহস করে বাধা দিয়েছিলে বলেই খুনীরা পালাতে পারেনি। এর জন্যে অবশ্যই তোমরা উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। তবে তার আগে ডাকাতদের দলটাকে শায়েস্তা করতে হবে। ওদেরকে এমন সাজা দেব, বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।'

সান্তা ফের নাবিকরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কথা জেনে ফেলল। বাস্‌কেথ আর ডেভিসকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাল তারা। গল্পগুজবের ফাঁকে কখন যে রাত শেষ হয়ে গেছে ওরা কেউ টেরই পায়নি। ভোরের আলোকে আজ মনে হলো আশীর্বাদ। ডেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল, আকাশের রঙ হালকা নীল। দিগন্তের কাছে সাগর লাল হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে নতুন তিনজন রক্ষীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে বাস্‌কেথ। তাদের মুখেই খবরটা পেল ও। কাল রাতে সান্তা ফের একদল সশস্ত্র লোক জলদস্যুদের জাহাজটা দখল করতে গেছে।

সেরেসান্তে আর ভার্গাস মারা গেলেও, পালের গোদা কনগ্রে আর তার দশ-বারোজন শিষ্য এখনও বেঁচে আছে। দ্বীপেই কোথাও লুকিয়ে আছে তারা। যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে তাদেরকে। নতুন তিন রক্ষীকে এই দ্বীপে রেখে যাবেন ক্যাপটেন লাফায়েত, আর কিছু না হোক তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেও জলদস্যুদের গ্রেফতার করা দরকার। কাজটা খুব কঠিন

হবে, কারণ দ্বীপটা তো আর ছোট নয়। একটা দিক আবার অসম্ভব দুর্গম। জলদস্যুরা হয়তো সেদিকেই গা ঢাকা দিয়েছে। তা দিক, ধরা তাদেরকে পড়তেই হবে। যতদিন না ধরা পড়ছে ততদিন দ্বীপ ছেড়ে নড়বে না সান্তা ফে।

বাস্‌কেথ জানাল, জলদস্যুদের কাছে খাবার নেই। সেইন্ট বার্থোলোমিউ অন্তরীপের কাছে ওদের একটা আস্তানা ছিল, অনেক আগেই সেটা খালি হয়ে গেছে। ইগোর উপসাগরের তীরে একটা গুহায় রসদ রেখেছিল, তা-ও সরিয়ে ফেলেছে। না খেয়ে কতদিন আর থাকতে পারবে।

ভোরবেলাই জলদস্যুদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপটেন লাফায়েত। সঙ্গে বাস্‌কেথ আর ডেভিস তো থাকলই, আরও থাকল বেশ কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক। জলদস্যুদের গুহায় এসে কাউকে পাওয়া গেল না। সামান্য কিছু মাল-পত্র ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। খাবারদাবার বা মূল্যবান সামগ্রী সবই অনেক আগে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রাতে হয়তো জলদস্যুরা এখানে একবার এসেছিল, আত্মগোপনের জন্যে জায়গাটা নিরাপদ মনে না হওয়ায় অন্য দিকে চলে গেছে।

ক্যাপটেন লাফায়েত ভাবছেন, এই দ্বীপে বেশিদিন লুকিয়ে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, কাজেই জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করাই উচিত। কিন্তু তা যখন তারা করছে না, তল্লাশী চালিয়েই গ্রেফতার করতে হবে। সেইন্ট বার্থোলোমিউ অন্তরীপ পর্যন্ত চষে ফেললেন তিনি, কিন্তু জলদস্যুদের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। এভাবে পরপর কয়েক দিন ধরে তল্লাশী চলল। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

তারপর, অবশেষে, মার্চের দশ তারিখে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অল্প কয়েকজন লোক বাতিঘরের ফটক দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ভেতরে ঢুকল। জানা গেল, সবাই তারা ফিজির লোক। ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়া লোকগুলো আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই এখানে এসেছে। ভাল খাওয়াদাওয়া করিয়ে চাঙা করা হলো তাদের, তারপর পায়ে শেকল পরিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো সান্তা ফের জেলখানায়।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর পাঁচটা লাশ পাওয়া গেল। লেফটেন্যান্ট রিগাল ওয়েবস্টার অন্তরীপে তল্লাশী চালাতে গিয়েছিল, সেখানেই পড়ে থাকতে দেখল লাশগুলো। সান্তা ফের ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, লোকগুলো মারা গেছে অনাহারে। বাস্‌কেথ বলল, এগুলোর মধ্যে কনগ্রের লাশ নেই।

তল্লাশ চালানো বন্ধ হয়নি। কিন্তু কনগ্রেকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর একদিন বাতিঘর থেকে পাঁচশো গজ দূরে এক লোককে দেখা গেল। টলতে টলতে এদিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না। অনেক কষ্টে সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে লোকটা, দু'এক পা এগোচ্ছে, কিন্তু তারপরই আবার পড়ে যাচ্ছে।

নতুন আসা রক্ষীদের সঙ্গে বাতিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল বাস্‌কেথ। হঠাৎ লোকটার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কনগ্রে! কনগ্রে আসছে! ওই যে, ওদিকে...'

চিৎকার শুনে তখুনি সেখানে ছুটে এলেন ক্যাপটেন লাফায়েত ও লেফটেন্যান্ট রীগাল। কয়েকজন নাবিককে নিয়ে এরইমধ্যে কনগ্রের দিকে ছুটতে শুরু করছে ডেভিস।

কনগ্রের এদিকে আসাটা সত্যি বিস্ময়কর। কিসের আশায়

আসছে সে? ধরা দিয়ে তো কোন লাভ হবে না! তার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই, ফাঁসিতে তাকে অবশ্যই চড়তে হবে। সব জেনেও কেন সে আসছে?

ডেভিস আর নাবিকরা কনগ্রের কাছে তখনও পৌঁছায়নি, হঠাৎ একটা রিভলভার গর্জে উঠল। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কনগ্রে। ক্যাপটেন লাফায়েত প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে শুরু করলেন। কার এত সাহস যে তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে, কনগ্রেকে গুলি করল? আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার কে তাকে দিল? অসম্ভব, এত বড় অন্যায় তিনি ক্ষমা করবেন না। কনগ্রে আত্মসমর্পণ করতে আসছিল, সে সুযোগ তাকে অবশ্যই দেয়া উচিত ছিল।

তারপর জানা গেল, ক্যাপটেন লাফায়েত অনেকটা দূরে ছিলেন বলে আসল ঘটনা বুঝতে পারেননি। কনগ্রেকে কেউ গুলি করেনি। সে নিজেই নিজেকে গুলি করেছে। কেন, বাতিঘরের সামনে এসে আত্মহত্যা করল কেন? তারও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কনগ্রে ভেঙেছে, কিন্তু মচকায়নি। তার বেল্টে রিভলভার ছিল, সেটা বের করে নিজের কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছে সে। সবাইকে দেখিয়ে ফাঁসির রশিকে ফাঁকি দিয়েছে জলদস্যুদের সর্দার।

স্টাটেন আইল্যান্ডে গত তিন মাস ধরে রোমহর্ষক একটা নাটক চলছিল, কনগ্রে আত্মহত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাপ্তি ঘটল।

মার্চের তিন তারিখ থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে নিয়মিতই বাতিঘরের

আলো জ্বালানো হচ্ছে। নতুন রক্ষীদের সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছে বাস্‌কেথ। জলদস্যুদের মাত্র সাতজন বেঁচে আছে, তাঁরাও সান্তা ফের অন্ধকার খুপরিতে বসে ফাঁসিতে চড়ার প্রহর গুণছে। ক্যাপটেন লাফায়েত তাদেরকে জেরা করে জেনেছেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অসংখ্য জাহাজকে ডুবিয়েছে তারা, খুন করেছে অগুনতি মানুষকে। বুয়েনস আইরেসের আদালতে খুব তাড়াতাড়ি তাদের বিচার শুরু হবে। বিচারে যে তাদের প্রতেকেরই ফাঁসি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডেভিস আর বাস্‌কেথ সান্তা ফেতে চড়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। প্রথমে ওরা বুয়েনস আইরেসেই যাবে। ওখান থেকে ডেভিস চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের মবিলে। নতুন একটা কাজ যোগাড় করতে তার কোন অসুবিধে হবে না। তবে বাস্‌কেথ দেশে ফিরে আর কোন কাজ খুঁজবে না, কারণ তার অবসর নেয়ার সময় হয়েছে। সারাটা জীবনই তো দুঃসাহসিক কাজে কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কাটল, কাজেই এবার চাই বিশ্রাম। তবে দেশে ফিরছে ঠিকই, মনটা ভাল নেই। এসেছিল তিনজন, ফিরতে হচ্ছে একা। বন্ধুদের কথা ভেবেই মনটা ওর বিষণ্ন হয়ে আছে।

বাতিঘরের টাওয়ারকে বিদায় জানাবার জন্যে সান্তা ফের ডেক থেকে কামান দাগা হলো। তারিখটা ছিল আঠারোই মার্চ।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এই সময় রওনা হলো সান্তা ফে। সন্ধ্যার কালো ছায়া যখন গাঢ় হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সমস্ত কালিমা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল চোখ-ধাঁধানো তীব্র আলোর একটা বন্যা। সেই আলো গায়ে মেখে ঝিকিয়ে উঠল সাগরের

ঢেউ। রাত যত বাড়ছে আলোর উজ্জ্বলতাও তত বাড়ছে। সেই সঙ্গে আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সান্তা ফে।

জোয়ার শুরু হয়েছে আগেই। আলোকিত বালিয়াড়িগুলো একে একে ডুবে যাচ্ছে। সান্তা ফের ডেকে দাঁড়িয়ে স্টাটেন আইল্যান্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বাস্কেথ আর ডেভিস। দু'জনেই ওরা এই দ্বীপে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের চিরকালের জন্যে রেখে যাচ্ছে, যাদের কথা কোনদিন ওরা ভুলতে পারবে না। মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকলেও একটা কথা ভেবে দু'জনেই ওরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ—অদ্ভুত হলেও সত্যি যে আজও ওরা বেঁচে আছে।

* * *

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রতি গুদাম স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু দুর্লভ বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই বইগুলোর দাম একেবারেই কম। দেড়-দুশো পৃষ্ঠার বই, দাম হয়তো ৬, ৮, ১০ বা ১২ টাকা। বইগুলির কোন কোনটায় সামান্য খুঁত আছে, তবে বেশির ভাগই মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। এসব বই পাঠকের কাছে বিক্রির জন্যে ৪০% কমিশন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টাকার একটি বই আপনি পাবেন ৭ টাকা ২০ পয়সায়, এবং ৬ টাকার বই মাত্র ৩টা ৬০ পয়সায়। যাঁরা এক খণ্ডের দুষ্প্রাপ্য রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, ক্লাসিক, টারজান, জুলভার্ন, অনুবাদ, উপন্যাস ইত্যাদি বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তাঁরা আজই সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস ২৪/৪ সেগুনবাগিচায়, অথবা আমাদের শো-রুম ৩৬/১০ ও ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকায় যোগাযোগ করুন। পাঠকদের বাছাই করে কেনার সুবিধার্থে এসব বই আমরা হেড অফিসে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছি।